ঈশাবাস্যোপনিষদ্

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

৪/১২/২০১০

হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত মূল শক্তির উৎস উপনিষদ। বাল্মীকি রামায়ণ বা মহাভারত ও পুরানে অনেক জায়গায় কিছু ফাঁক থেকে যায়, এই ফাঁকটাকে পূরণ করার জন্য কবি নিজের তরফ থেকে কিছু চিন্তা ভাবনা ও কল্পনাকে সংযোজিত করে দেন। কিন্তু উপনিষদে এই ধরণের কোন কাল্পনিক কিছু নেই, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যেমনটি প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিক তেমনটিই তিনি শিষ্যদের দিয়ে গেছেন, বেদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই জিনিষ হয়েছে। তবে বেদের অনেক স্তুতি মূলক মন্ত্র আছে, যেমন এই মন্ত্রে এই ফল পাবে, অমুক মন্ত্রে এই ধরণের ফল পাবে, তবে এগুলো সবই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের থেকে এসেছে। উপনিষদে এই ধরণের কোন স্তুতিও নেই, ঋষিরা যেমনটি দেখেছেন তেমনটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যে কোন ধর্ম চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে, দর্শন, পুরান, তন্ত্র ও সামাজিক রীতিনীতি বা স্মৃতি। হিন্দুধর্মে এই চারটিকে পরিষ্কার আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায়। হিন্দুধর্মের দর্শন সম্বন্ধে যা কিছু বলার তার সবটাই উপনিষদে দেওয়া আছে। যে নিজেকে হিন্দু বলে স্বীকার করছে, তাকে তার ধর্মের দর্শনকে জানতে হলে উপনিষদেই যেতে হবে, উপনিষদের বাইরে হিন্দুধর্মের দর্শন কোন ভাবেই যাবে না। কোন হিন্দুই উপনিষদের বাক্যকে অস্বীকার করতে পারবে না।

উপনিষদ অতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র, এতই পুরনো যে, যদিও শঙ্করাচার্য নিজে উপনিষদের ভাষ্য রচনা করে গেছেন, কিন্তু তাও অনেক ক্ষেত্রেই উপনিষদের অনেক অর্থের বোধগম্য করা খুবই দুরূহ হয়ে যায়। কঠোপনিষদ বা মুণ্ডকোপনিষদ যদিও কিছুটা বোঝা যায় কিন্তু ঈশাবাস্যোপনিষদ সব থেকে প্রাচীন উপনিষদ, যদিও অনেকে এটিকে পরের দিকে রচনা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু এর প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন সংশয়ই কারুর হওয়া উচিত নয়। এর ফলস্বরূপ ঈশাবাস্যোপনিষদকে বোঝা আরও কঠিন হয়ে যায়। বিদেশী পণ্ডিত যারা ঈশাবাস্যোপনিষদ অনুবাদ করেছেন, তাঁরাও অনেক জায়গায় স্বীকার করেছেন যে এই উপনিষদ এতই পুরনো যে এর অনেক কিছু তাদের কাছে পরিষ্কার নয় ঋষি এখানে কি বলতে চেয়েছেন।

ভারতে যখনই কেউ একটা নতুন দর্শনের তত্ত্বকে পণ্ডিত মহলে উপস্থাপিত করতে চাইবেন, তখন তাঁকে প্রথমে তিনটি বইয়ের উপর ভাষ্য দিতে হবে, এই তিনটে বইকে একসাথে বলা হয় – প্রস্থানত্রয়। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র আর গীতা এই তিনটি বই নিয়ে প্রস্থানত্রয়। উপনিষদে যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাঁরা যেমনটি দেখেছেন ঠিক তেমনটি রেখে দিয়েছেন। এটা অবশ্য ঠিক পরিষ্কার নয় যে, একেকটি উপনিষদের মন্ত্রের দ্রষ্টা শুধু মাত্র একজন ঋষিই কিনা। এমনও হতে পারে, একই উপনিষদের কিছু মন্ত্র একজন গুরু পেয়েছিলেন, কিছু মন্ত্র অন্য কোন গুরু পেয়েছিলেন, পরে কোন শিষ্য গিয়ে পরম্পরার সূত্র ধরে দুটোকে একই জায়গাতে সংযোজিত করে সঙ্কলন করে দিয়েছেন। এই কারণে আমাদের যত উপনিষদ আছে তার সব মন্ত্রের অর্থ এক জায়গায় দাঁড় করান খুব মুশকিল হয়ে যায়। আমরা জানি বেদের চারটি অঙ্গ – সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। এটাও আমরা জানি যে বেদের অনেক শাখা আছে, অন্য দিকে বলা হয় বেদের অনেকগুলো শাখা লুপ্ত বা হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাওয়ার ফলে, অনেক পণ্ডিত হঠাৎ করে একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে বলবেন – এই পাণ্ডুলিপিটা একটি উপনিষদ। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই উপনিষদটি কোথা থেকে এসেছে? তখন বলবেন এটি বেদের হারানো শাখা থেকে এসেছে। কোন্ হারানো শাখা? গায়ের জোরে তখন একটা বেদের নাম করে দেবে। এর ফলে এখনও অনেকেই নতুন নতুন কিছু নিয়ে এসে বলে দিচ্ছে এটা উপনিষদ। কিছু দিন আগে এই রকম আল্লাহোপনিষদ আবিষ্কার হয়েছে। আল্লাহোপনিষদকে যে কেউ দেখলেই বলে দিতে পারবেন এটা আকবরের সময়ে লেখা হয়েছে। কিন্তু এরা বলবে, তা কি করে হবে, এটা বেদেরই অঙ্গ। এইভাবে একের পর এক উপনিষদ যদি আবিষ্কার হতে থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল ভারতে কত উপনিষদ আছে। অনেকে বলেন ১০৮টি উপনিষদ আছে, আবার অনেকে বলেন ১৩২টি উপনিষদ আছে। আচার্য শঙ্কর দশটি উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করেছেন, যদিও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ নিয়ে বিতর্ক আছে, অনেকে বলেন এর ভাষ্য শঙ্করাচার্যই করে গেছেন, অনেকে আবার মনে করে এই উপনিষদের ভাষ্য শঙ্করাচার্য করে যাননি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদকে নিয়ে মোট এগারটো উপনিষদকেই আমাদের মঠ মিশনের পরম্পরাতে প্রামাণিক বলে মনে করা হয়। এই এগারোটা উপনিষদের বাইরেও আচার্য শঙ্কর আরও চার পাঁচটি উপনিষদের অনেক

মন্ত্রকে গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্য রচনার সময় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই চারটিকে নিয়ে মোটামুটি চৌদ্দ পনেরোটা উপনিষদের প্রামাণিকতা পাওয়া যাচ্ছে। এর বাইরে যত উপনিষদ আছে, সবারই খুব সুন্দর বক্তব্য, কিন্তু প্রামাণিকতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব মুশকিল।

উপনিষদের সমস্ত বক্তব্য একটা জায়গাতেই পাওয়া যাবে না, সমস্তটাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বক্তব্যগুলোকে যদি উপর উপর পড়া হয় তখন মনে হবে উপনিষদগুলি এক জায়গায় এক রকম কথা বলছে, অন্য উপনিষদে মনে হবে যেন অন্য কথা বলা হচ্ছে। এই আপাত অসম্বদ্ধ বক্তব্যগুলোকে একটা প্রামাণিকতাতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাসদেব একটা বই লিখলেন, তার নাম ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রকে বাদ্রায়ণ সূত্রও বলা হয়, অনেকে ব্যাসসূত্রও বলেন, কেউ বেদান্তসূত্রও বলেন। উপনিষদ ঠিক কি বলতে চাইছে, উপনিষদের মূল বক্তব্য কি, এইটাকে তুলে ধরার জন্য ব্যাসদেব নিজে ৫৫৫টি সূত্রে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছিলেন। ব্যাসদেবই আবার মহাভারতে গীতা রচনা করেছেন। উপনিষদের সারটাকে নিয়ে তিনি গীতার রচনা করলেন, বলা হয়, উপনিষদ হল গাভী, গাভীকে দোহন করে যে দুধ পাওয়া গেল, সেই দুধটুকু হল গীতা। তার মানে গিয়ে দাঁড়াল, হিন্দুধর্মের প্রামাণিক দর্শন উপনিষদ, উপনিষদের তিনটে দিক – একটা দিক হচ্ছে উপনিষদ নিজে, দ্বিতীয় ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদে কি আছে সেটাকেই ব্রহ্মসূত্রে সূত্রাকারে রেখে দেওয়া হল, আর তৃতীয় দিক হল গীতা। সেইজন্য যাঁরাই নতুন কোন দর্শনকে দাঁড় করাতে চাইবেন তাঁদের এই তিনটে প্রামাণিক গ্রন্থের উপর আগে ভাষ্য রচনা করে প্রমাণ করে দেখাতে হবে এই তিনটে গ্রন্থ যা বলছে আর আমি যে নতুন দর্শন দিচ্ছি সেটা এক। এই তথ্যগুলো খুব গভীর বিষয়, এগুলো ঠিক মত না বুঝলে ধরতে পারবো না আচার্য কোথায় কেন ও কিভাবে উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন। উপনিষদকে বোঝা খুব কঠিন, সেইজন্য বেশির ভাগ মানুষ উপনিষদ থেকে দূরে থাকতে চায়। ব্যসদেব যখন উপনিষদের বক্তব্যকে বোঝাবার জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করলেন, সেখানে তিনি আবার সব কিছুকে সূত্রাকারে রেখে দিলেন। সূত্রগুলিকে আবার অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সূত্রকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হবে সেটার উপর নির্ভর করে সূত্রের অর্থ কোন দিকে যাবে। আমাদের নামকরা যে কটি প্রামাণিক ভাষ্য আছে তার মধ্যে শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মাধ্বাচার্যের ভাষ্যই প্রধান। এনারা তিনজনই বিশ্লেষণ করে দেখাবেন, আমার বক্তব্যের সাথে উপনিষদের বক্তব্য, ব্রহ্মসূত্রের বক্তব্য আর গীতার বক্তব্য এক। আচার্য শঙ্কর দেখাচ্ছেন, এই তিনটিরই বক্তব্য অদ্বৈতবাদের কথা বলছে, রামানুজম্ বলবেন বিশিষ্টাদ্বৈতকেই এই তিনটি গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে আর মাধ্বাচার্য সরাসরি বলে দেবেন – না, এই তিনটেরই বক্তব্য দ্বৈতবাদকে সিদ্ধ করছে। এই তিনজন আচার্যই কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মকে অনুসরণ করে তাঁরা প্রত্যেকটি সূত্র বা মন্ত্রের অর্থকে ব্যাখ্যা করেছেন।

ভারতে ছয় রকমের দর্শন আছে, এই ছয়টি দর্শনকে বলা হয় আস্তিক দর্শন। এদের মধ্যে মীমাংসকরা, অর্থাৎ কর্মকাণ্ডীরা একটা শাস্ত্র রচনা হওয়ার পর সেই শাস্ত্রের মূল বক্তব্যটা কি, এটাকে ঠিক করার জন্য কিছু নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন। এই নিয়মগুলিকে এক কথায় বলা হয় ষড়লিঙ্গ। যে কোন শাস্ত্র যখন এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণ করে তখনই সেটা পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র বলে বিবেচিত হবে। এখন আচার্য শঙ্করও এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যকে নিয়েই দেখাবেন তাঁর বক্তব্য ঠিক, সেইভাবে রামানুজমও দেখাবেন আবার মাধ্বাচার্যও এই ছয়টি নিয়মকেই সামনে নিয়ে এসে দেখাবেন তাঁর বক্তব্যই ঠিক। এর মধ্যে মজার ব্যাপার পূর্বমীমাংসকরাই ঠিক ঠিক বেদকে পালন করে, ঠিক ঠিক বেদজ্ঞ বলতে এরাই, বেদের অর্থ নিরুপণ এরাই করে গেছে, এরা বলে বেদের উদ্দেশ্য হল মানুষ যজ্ঞ-যাগ করবে, যা কিছু দৃষ্ট অদৃষ্ট ফল পেতে চায়, দৃষ্ট মানে এই জীবনেই অর্থ, সম্পদ, মান যশ লাভ করা, আর অদৃষ্ট মানে মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি, এই দৃষ্ট আর অদৃষ্ট যা কিছু ফল আছে তাকে পাওয়ার জন্যই বেদের মন্ত্র ও যজ্ঞ। বেদের ব্রাহ্মণ যজ্ঞকে ব্যাখ্যা করছে, কিভাবে যজ্ঞটা করা হবে। কিন্তু উপনিষদে এসে সমস্যা হয়ে যায়, কারণ উপনিষদে এই ধরণের যজ্ঞ সম্পর্কিত কোন কিছুই নেই। পূর্বমীমাংসকরা, যারা ঠিক ঠিক বেদজ্ঞ, তারা বলে আরণ্যক আর উপনিষদ হল বেদের অন্ত। বেদের অন্ত বলতে তারা খারাপ অর্থেই বলছে, অন্ত মানে এই দুটো বেদের কিছুই নয়, এগুলো যেন ফালতু, এই দুটো হল বেদের লেজ। কিন্তু লেজই যদি বলা হয় তাহলে উপনিষদকে বেদ বলে সম্মান কেন দেওয়া হচ্ছে? এরা তখন বলবে, এই কারণেই সম্মান দেওয়া হয়, যখন তুমি কোন যজ্ঞ করছ তখন যদি উপনিষদের মন্ত্রগুলি পাঠ কর তাহলে তোমার যজ্ঞটা আরও ফলপ্রসু হবে, এর বেশি এর কোন মূল্য নেই। আচার্য শঙ্কর পূর্বমীমাংসকদের বক্তব্যকে নিয়েই ওদেরই যুক্তিকে নিয়ে ঘুরিয়ে ওদেরকেই তর্কযুদ্ধে কাবু করে দিচ্ছেন। তিনি বলবেন হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছে উপনিষদ হল বেদের অন্ত, বেদের লেজ, মানে বেদের সার। সব কিছু করে করে যেখানে গিয়ে জিনিষটা দাঁড়াচ্ছে সেটাই হল বেদান্ত, অর্থাৎ বেদ কি বলতে চাইছে সেটাই গিয়ে বেদান্তে বলা হচ্ছে।

আচার্য মীমাংসকদের নিয়মকে মেনে, কারণ মীমাংসকরাই ষড়লিঙ্গকে ঠিক করে দিয়েছে, ওদের এই ছয়টি নিয়মকে আধার করে উপনিষদের উপর প্রয়োগ করে দেখাচ্ছেন উপনিষদের বক্তব্য একটাই, সেটা হচ্ছে আত্মব্রহ্মৈক্য, আত্মাই হচ্ছেন ব্রহ্ম, এইটাই বেদের মূল বক্তব্য। এই বিশাল বেদের সার হচ্ছে উপনিষদ, এই কারণে উপনিষদ খুবই জটিল হয়ে যায়। উপনিষদকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হিন্দুধর্মই শেষ হয়ে যাবে। যদিও হিন্দুধর্ম এখন বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটবৃক্ষের মত বিশাল বড় হয়ে গেছে, এর কোনটা আসল শেকড় এখন আর বোঝার উপায় নেই। একটা শেকড় কেটে দিলেও আরও হাজারটা শেকড় থেকে যাবে। কিন্তু যতই অনেক শেকড় থাক, উপনিষদ হল হিন্দুধর্মের প্রাণ। হিন্দুধর্মের প্রাণ উপনিষদকে বাঁচাতে গিয়ে আচার্যকে অনেকগুলো আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথমে চার্বাকদের আক্রমণকে মোকাবিলা করতে হবে, এরপর বৌদ্ধদের সাথে লড়াই করতে হবে, বৌদ্ধদের মধ্যেই আরও কত শাখা আছে তাদের বিরুদ্ধেও বলতে হবে। কিন্তু সব থেকে বড় আক্রমণ আসে মীমাংসকদের দিক থেকে, কারণ মীমাংসকরাই বেদের ঠিক ঠিক পণ্ডিত। এখন কেউ যদি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের উপর নতুন এমন কোন কিছু মন্তব্য করে যেটা প্রচলিত চিন্তা ধারা থেকে আলাদা। এরপর এই মতবাদ নিয়ে যতই তর্ক বিতর্ক হোক না কেন, শেষে কিন্তু তাকে বেলুড় মঠেই আসতে হবে, কারণ বেলুড় মঠ হল ঠাকুরের ভাবধারার গড়। পূর্বমীমাংসকরাও হল বেদের গড়। তাই উপনিষদকে বাঁচাতে হলে আগে উপনিষদের প্রধান প্রতিপক্ষ পূর্বমীমাংসকদের আক্রমণকে ভোঁতা করতে হবে।

শঙ্করাচার্যের আগে যাঁরা আচার্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সমুচ্চয়, সমুচ্চয় হচ্ছেন সমন্বয়কারী। এর মধ্যে খুব নামকরা সমুচ্চয় হল জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়, অর্থাৎ এনারা জ্ঞান ও কর্মকে সমন্বয় করে একটা মতবাদকে দাঁড় করিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য এই জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, কারণ জ্ঞান আর কর্মের মধ্যে কখনই সমুচ্চয় হয় না। অথচ এই ঈশাবাস্যোপনিষদে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় মন্ত্রের মধ্যেই উল্লেখ করা আছে। এখন বেদ বা উপনিষদের মন্ত্রে যা বলা হয়ে গেছে সেই ব্যাপারে কারুর কোন প্রশ্ন করার কোন ক্ষমতাই হবে না। এখানে এসে আচার্য শঙ্কর দেখাবেন এই উপনিষদে জ্ঞান বলতে কোন জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। শঙ্করাচার্যের কাছে পরমার্থ জ্ঞানই হল আসল জ্ঞান। পরমার্থ জ্ঞানের বাইরে বাকি যত জ্ঞান আছে যেমন ব্যবহারিক জ্ঞান, যে জ্ঞানে জগৎ চলছে, দেবতা বিষয়ক জ্ঞান, যজ্ঞ বিষয়ক জ্ঞান, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞানের শেষ জ্ঞান হচ্ছে পরামার্থিক জ্ঞান, পরামার্থিক জ্ঞান মানে – *অহং ব্রহ্মাস্মি* বা *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। আচার্য বলছেন, *অহং ব্রহ্মাস্মি* এই জ্ঞানের সাথে আর কোন কিছুর সমুচ্চয় হবে না কিন্তু অন্যান্য যে জ্ঞান আছে তার সাথে সমুচ্চয় হতে পারে। এত কথা বলার একটাই মূল ব্যাপার, তা হল বিভিন্ন কালে উপনিষদের বিভিন্ন ঋষিরা মূল সত্তাকে যে রূপে দর্শন করেছিলেন, সেই রূপটি নিজের শিষ্যদের দিয়ে চলে গেছেন। হাজার হাজার বছর যাবৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন সত্তাকে দর্শন করেছিলেন, দুটো কথা এই ঋষি বলে গেছেন, চারটে কথা অন্য ঋষি বলে গেছেন, সবাই নিজের নিজের যা যা উপলব্ধি হয়েছে সেই উপলব্ধির কথা বলে গেছেন। পরের দিকে এসে সবার উপলব্ধিকে এক জায়গায় মেলানো খুব কঠিন কাজ। ঠাকুরের দেড়শ বছরের মধ্যেই ঠাকুর যা বলে গিয়েছিলেন, এখন সমাজের চিত্র অনেক পাল্টে গেছে, এখন যারা সেই কথার উপরে বিচার ধারাকে নিয়ে আসবেন সেই কথাই অনেক ক্ষেত্রেই পাল্টে যাবে। এই ব্যাপারটাকে মিলিয়ে চলা খুব কঠিন। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর যখন তাঁর নিজের ভাষ্য রচনা করছেন, তখন তিনি সামগ্রিক চিত্রটাকে মাথার মধ্যে রেখে দেখাচ্ছেন যে উপনিষদের এই মন্ত্রের অর্থ এইটাই হবে। এই কারণে শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ছাড়া অন্য কারুর ভাষ্যকে নিয়ে যদি উপনিষদ অধ্যয়ণ করা হয় তাহলে কিন্তু উপনিষদের অর্থকে অনুধাবন করতে গিয়ে অনেক সমস্যা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আচার্যের ভাষ্যকে নিয়েও যদি উপনিষদ পাঠ করা হয় তখনও তার অর্থকে অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন মনে হবে।

আচার্য শঙ্করের একটাই বক্তব্য, ঘুরে ফিরে একই কথাতে এনে দেখাবেন আত্মাই ব্রহ্ম, *অহং ব্রহ্মাস্মি,* এ ছাড়া আর কিছুই নেই। যত উপনিষদ আছে সবার এই একটাই বক্তব্য, আমিই সেই আত্মা, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। গীতা, বাল্মীকি রামায়ণে অনেক বক্তব্য পাওয়া যাবে, মহাভারতে বক্তব্যের ফুলঝুড়ি। হিন্দুধর্মে এই ধরণের বইয়ের শেষ নেই। স্বামী চিন্ময়ানন্দজী এক জায়গায় ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেখানে কয়েকজন যুবক প্রশ্ন করে, স্বামীজী খ্রীশ্চানদের বাইবেল আছে, মুসলমানদের কোরান আছে, আমাদের হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলতে কি একমাত্র গীতাকেই বোঝায়? স্বামী চিন্ময়ানন্দজী তখন হেসে উত্তর দিচ্ছেন – সব ধর্ম তাদের একটা বইতেই শেষ হয়ে যায়, আমাদের পুরো লাইব্রেরী আছে। একটা বই দিয়ে হিন্দুধর্মকে মাপা যাবে না, একটা বই দিয়ে হিন্দুধর্মকে মাপতে গেলে হিন্দুধর্মের মূল ভাবটাই বিকৃত হয়ে হারিয়ে যাবে। কিছু দিন আগেও অনেকেই হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে বলত, খ্রীশ্চান ধর্মকে যিশু দাঁড় করিয়ে গেছেন, মহম্মদ ইসলামকে

দাঁড় করালেন, হিন্দুধর্মকে কে দাঁড় করিয়েছে? স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বিশ্বজনীন ধর্মের কথা আলোচনা করেছেন, সেখানে তিনি ঠিক এই বক্তব্যকেই আক্রমণ করে বলছেন, বিশ্বজনীন ধর্ম যখনই আসবে তখন সেই ধর্মকে একটা ব্যক্তি বিশেষের উপর আধারিত করে দাঁড় করান যাবে না।

যদি কাউকে বলা হয় মহাভারতের পুরো বক্তব্যকে একটি কি দুটি বাক্যে বলতে, সে কখনই বলতে পারবে না। কিন্তু বাইবেলের বক্তব্যকে একটা কথায় বলা যায় যে তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো বা আরেকটু টেনে বলা যেতে পারে তোমার সামাজিক ব্যবহার কেমন হবে। মহাভারতের ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না, কারণ মহাভারতে সব কিছুই আছে, ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, তখনকার দিনের বিজ্ঞানের যে ধ্যান-ধারণা সেগুলো আছে, সমাজ শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র থেকে শুরু করে কি না নেই, তাই মহাভারতের সম্বন্ধে বলা হয়, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তার সবটাই মহাভারতে আছে। তাই এক কথায় মহাভারতের বক্তব্যকে কি করে বলা যাবে? কিন্তু উপনিষদের ক্ষেত্রে একটাই কথা, *অহং ব্রহ্মাস্মি*, যতই ঘুরুক, ডান দিক বাঁ দিক সব ঘুরে এই একটা জায়গাতেই ফিরে আসবে, *অহং ব্রহ্মাস্মি*। এর ফলে ভাষ্যকাররা যখন উপনিষদের এটা সেটা ব্যাখ্যা করে যখন সেই ব্যাখ্যাটাকে এই *অহং ব্রহ্মাস্মিতে* নিয়ে মেলাতে যাবেন তখন এই ব্যাপারটাই খুব কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু আচার্য তাঁর ভাষ্যে প্রখর যুক্ত ও প্রামাণিকতা দিয়ে একটা জায়গা, *অহং ব্রহ্মাস্মিতে* নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ভাষ্য দেওয়ার সময় আচার্য শঙ্কর এই ব্যপারটাকে সব সময় মাথার মধ্যে বসিয়ে রেখেছেন যাতে *অহং ব্রহ্মাস্মি* এই মূল ভাবটা যেন কোন অবস্থাতেই কোন ব্যাখ্যাতেই ছিটকে বেরিয়ে না যায়, কেননা যাই ব্যাখ্যা দেওয়া হোক না কেন পরে কিন্তু এই *অহং ব্রহ্মস্মিতে* এনে সেই ব্যাখ্যাকে মেলাতে হবে। উপনিষদ যেখানে যা বলছে আচার্য শঙ্কর সেখানে ঠিক সেই রকম ব্যাখ্যাটিই করছেন, কিন্তু টেনে ঐ ব্যাখ্যাটাকেই পরে মিলিয়ে দিচ্ছেন এই একটি জায়গাতে। সেইজন্য যে কোন মানুষের পক্ষে উপনিষদ বোঝা ও ধারণা করা খুব কঠিন হয়ে যায়।

আচার্য শঙ্করের মতে বেদের ধর্ম দুই প্রকার – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। যাদের সামর্থ আছে তারা সংসার ত্যাগ করবে, যাদের সামর্থ নেই তারা সংসার করবে। ঈশাবাস্যোপনিষদ এই অর্থে সম্পূর্ণ উপনিষদ। কারণ অন্য যত উপনিষদ আছে, যেমন কঠোপনিষদ বা মুণ্ডকোপনিষদে কর্মের কথা বলা নেই, এখানে কর্মের শুধু নিন্দাই করা হয়েছে। এই কারণে আগেকার দিনের ঋষিরা গৃহস্থদের সামনে উপনিষদের কথা বলতেন না। মূলতঃ উপনিষদ হচ্ছে ত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্য, উপনিষদ মানেই হচ্ছে পুরো নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। বেদের প্রথম অংশ, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ হচ্ছে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, মানে সংসারীদের জন্য। সেই অর্থে ঈশাবাস্যোপনিষদ খুব বিচিত্র উপনিষদ, এর মধ্যে দুটো লক্ষণ ধর্মের কথাই বলা হচ্ছে। একমাত্র ঈশাবাস্যোপনিষদের চরিত্র গীতার সাথে মেলে বা পুরো বেদের সাথে মেলে। কারণ এই উপনিষদে প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ এই দুটো মার্গের কথাই বলা হয়েছে, অথচ মাত্র আঠারোটা মন্ত্র নিয়ে ঈশাবাস্যোপনিষদ।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারটি বেদ আমাদের। যজুর্বেদ আবার দুটি, শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্কের গুরু ছিলেন বৈশম্পায়ন, গুরুর সাথে বিবাদ হওয়াতে যাজ্ঞবল্ক গুরুর কাছে যে বিদ্যা পেয়েছিলেন সেটাকে বমির মাধ্যমে ত্যাগ করে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বৈশম্পায়ন দেখলেন এত দিনের এই বিদ্যা নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তিনি তাঁর বাকী শিষ্যদের তিতির পাখি হয়ে ঐ বমিটাকে গলাধঃকরণ করে নিতে বললেন, তখন এই বিদ্যার নাম হয়ে গেল কৃষ্ণযজুর্বেদ। অন্য দিকে যাজ্ঞবল্ক সব ফেলে দিয়ে চলে গেলেন সূর্যের উপসনা করতে। সূর্য তখন নিজেই পুরো বেদের জ্ঞানটা যাজ্ঞবল্ককে দিয়ে দিলেন, এই শাখার নাম হয়ে গেল শুক্লযজুর্বেদ। এইভাবে যজুর্বেদ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। দুটো বেদে একই ধরণের মন্ত্রের সংখ্যা বেশি হলেও কিছু কিছু আলাদা মন্ত্রও উল্লেখিত করা হয়েছে। এর মধ্যে নামকরা দুটো উপনিষদ বৃহদারণ্যক উপনিষদ আর ঈশাবাস্যোপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদে নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদ আর ঈশাবাস্যোপনিষদ আবার বিশেষ কারণে খুব ব্যতক্রমি। বেদের যেটা বৈশিষ্ট্য তাতে প্রথমে আসে মন্ত্র, তারপর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ এইভাবে পর পর আসে। বৃহাদারণ্যক উপনিষদে আরণ্যক অংশটা উপনিষদের মধ্যে ঢুকে গেছে, নামই হচ্ছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ, অথচ এর প্রথমের দিকে রয়েছে আরণ্যক। ঈশাবাস্যোপনিষদ আবার আরও বিচিত্র। শুক্ল যজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায়ে ঈশাবাস্যোপনিষদ। শুক্ল যজুর্বেদের ঊনচল্লিশটা অধ্যায় হচ্ছে পুরো সংহিতা বা মন্ত্র অংশ, যেটা যজ্ঞে ব্যবহার হয়। এর ঠিক পরেই চল্লিশতম অধ্যায় হচ্ছে ঈশাবাস্যোপনিষদ, কিন্তু বেদের নিয়মানুসারে হওয়ার কথা ছিল সংহিতা, সংহিতার পরে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পরে আরণ্যক, আরণ্যকের পরে উপনিষদ। ঊনচল্লিশটা অধ্যায় সংহিতা, বেদের নিয়ম মত যেটা যজ্ঞ-যাগে ব্যবহার করা হয়। কেন সংহিতার পরেই ব্রাহ্মণ ও আরণ্যককে সরিয়ে উপনিষদকে নিয়ে

আসা হয়েছে এর সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেননি। আচার্য শঙ্করও এই ব্যাপারে কোন ধরণের মন্তব্য করেননি। সবাই যে যার অনুমানের উপর কিছু একটা বলে দিয়েছে। এখানে একটা জিনিষ সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে যে, ঈশাবাস্যোপনিষদ অতি পুরনো, যেমনটি পাওয়া গেছে ঠিক তেমনটিই রাখা আছে।

শুক্লযজুর্বেদের এই চল্লিশতম অধ্যায়ে যজ্ঞের কোন ব্যাপার নেই, যজ্ঞ করলেও ফলের কোন ব্যাপার থাকবে না। ফলে যাঁরা যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ তাঁরা এই চল্লিশতম অধ্যায়কে কোন যজ্ঞেই ব্যবহার করেননা। সংহিতাতে যা কিছু স্তুতি বা মন্ত্র আছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ করা কিন্তু এই চল্লিশতম অধ্যায়কে আমাদের দেশে যত রকমের যজ্ঞ আছে তার কোন যজ্ঞেই ব্যবহার করা হয় না। এই পয়েন্ট থেকেই আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্য রচনা শুরু করছেন। মীমাংসকদের বিশ্বাস ছিল যে, যদি কোন যজ্ঞে উপনিষদ থেকে পাঠ করা হয় তখন সেই যজ্ঞের শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই কিছু কিছু যজ্ঞে, যজ্ঞ শেষ হওয়ার পর এই চল্লিশতম অধ্যায়কে পাঠ করা হয়, যাতে যজ্ঞের শক্তিটা আরও বৃদ্ধি পায়। আগেকার দিনে যখন কয়লা বা কাঠের আগুনে রান্না করা হত, তখন আগুনটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য উনুনের মধ্যে একটু চিনি ছড়িয়ে দিত, চিনি ছড়িয়ে দিলেই আগুনের শিখাটা দাউ দাউ করে বেড়ে যেত। যজ্ঞটা হচ্ছে আগুন আর ঈশাবাস্যোপনিষদ পাঠ করা মানে চিনি ছড়ানোর মত। আগুনে চিনি ছড়িয়ে দিয়ে কখনই রান্না করা যাবে না, কিন্তু আগুনটাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। মীমাংসকদের মতে কিছু কিছু যজ্ঞে চল্লিশতম অধ্যায়কে পাঠ করলে যজ্ঞের শক্তটা বেড়ে যায়, এ ছাড়া এই অধ্যায়ের যজ্ঞে আর কোন গুরুত্ব নেই। এই প্রেক্ষাপটের উপর ঈশাবাস্যোপনিষদ শুরু হচ্ছে।

আচার্য শঙ্করের সময় থেকে এমনকি তাঁর সময়ের আরও আগে থাকতে একটা বিষয়ে খুব বিতর্ক ছিল যে, উপনিষদকে বেদের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হবে কি, হবে না। আজকে আমরা যত সহজে বলে দিতে পারছি উপনিষদ বেদের অঙ্গ, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য শঙ্করের মত ব্যক্তিত্বকেও প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল উপনিষদকে বেদের অঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই কারণে আমাদের মত সাধারণ লোকেদের পক্ষে আচার্যের ভাষ্যকে অনুধাবন করা খুব কষ্টকর ও কঠিন মনে হবে। আচার্য শঙ্কর প্রথমে প্রমাণ করে দেখালেন, বেদ যদিও একমাত্র কর্মকাণ্ডের কথাই বলে কিন্তু বেদ কোথাও বলে না যে কর্মকাণ্ডই একমাত্র সত্য। সেইজন্য উপনিষদে যা কিছু বলা হয়েছে এটাও সত্য।

ষড়লিঙ্গের প্রথম নিয়ম হচ্ছে উপক্রম-উপসংহার, এর অর্থ হচ্ছে, একটা জিনিষের যে বক্তব্য সেটা দিয়ে শুরু হবে আবার সেই জিনিষটারই সমাপ্তি হবে সেই বক্তব্য দিয়েই। আচার্য শঙ্কর বলছেন, আত্মতত্ত্বের আলোচনা করাটাই হচ্ছে ঈশাবাস্যোপনিষদের উদ্দেশ্য। ঈশাবাস্যোপিনিষদের প্রথম মন্ত্র শুরু হচ্ছে *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং* দিয়ে আর শেষ হচ্ছে *স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-* এই সপ্তম মন্ত্রে, একই জিনিষ ঘুরে ঘুরে আসছে। উপক্রম যেখানে করা হচ্ছে উপসংহারকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্থবাদ করার জন্য মীমাংসকদের যে প্রথম শর্ত উপক্রম-উপসংহার, আচার্য দেখিয়ে দিলেন ঈশাবাস্যোপিনষদে প্রথম শর্ত কিভাবে পূরণ করা হচ্ছে, আত্মতত্ত্বের কথা দিয়ে শুরু, আত্মতত্ত্ব দিয়েই উপসংহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় শর্ত অভ্যাস, অভ্যাস বলতে বলা হয় একই জিনিষকে বারবার বলা। ঈশাবাস্যোপনিষদে আত্মতত্ত্বের কথা বারবার ঘুরে ঘুরে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন – শাস্ত্র ভালো কথা বলতে গিয়ে কখনই ক্লান্ত হয়ে যায় না, সেইজন্য শাস্ত্র একই ভাবকে বারবার উল্লেখ করবে। তাই ঈশাবাস্যোপনিষদ দ্বিতীয় শর্ত অভ্যাসকেও পূরণ করে দিল।

ষড়লিঙ্গমের তৃতীয় শর্ত হচ্ছে অপূর্বতা, এটাও পূর্বমীমাংসকদের থেকে এসেছে। একটা জিনিষকে যদি আমার ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে জেনে যেতে পারি তাহলে শাস্ত্রের আর কি আবশ্যকতা আছে। এখানে যে আলোটা জ্বলছে, এই আলোটাকে জানার জন্য কি আমাকে বেদ পাঠ করতে হবে? নিশ্চয়ই নয়। যদি কেউ বলে, আপনাদের বেদ পড়লে বিদ্যুৎ কিভাবে তৈরী হচ্ছে, বিগব্যাং কিভাবে হয় এগুলো জানা যাবে? এগুলোকে ব্যাখ্যা করার কাজ তো বেদের নয়। যে জিনিষ ইন্দ্রিয় দিয়ে করা যায়, সেটা কখনই শাস্ত্রের বিষয় হতে পারেনা। শাস্ত্রের বিষয় সব সময় হবে, যে জিনিষকে ইন্দ্রিয় বা ষট্ প্রমাণাদি দিয়ে জানা যায় না। তাহলে বলতে পারি শাস্ত্রের প্রমাণাদি কি করে হবে? তা কেন হবে, শাস্ত্র শুধু ইঙ্গিত মাত্র করে। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনার কি নাম, আমি তাকে আমার নাম বলে দিলাম, আমার নাম জানার জন্য আপনাকে শাস্ত্রবিদ্যাকে প্রয়োগ করতে হবে না। আমি নাম ভুল কি ঠিক বলছি তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমার নাম জানার জন্য আপনার শ্রবণ ইন্দ্রিয় যদি ঠিক থাকে, আর প্রমাণের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে তাতেই আমার নাম

আপনি জেনে যাবেন। আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন, আত্মতত্ত্ব কখনই ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। এটা যে শুধু ঈশাবাস্যোপনিষদের ক্ষেত্রেই বলা হবে তাই নয়, প্রত্যেক উপনিষদে এই কথাই বলা হয়। তৈত্তেরীয় উপনিষদে মন্ত্রই আছে – *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*, মন আত্মতত্ত্বকে ধরতে পারেনা। তাই আত্মতত্ত্ব অপূর্বতাতে সিদ্ধ হয়ে গেল।

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে ফল, আত্মতত্ত্বের সবই ঠিক আছে বুঝলাম, কিন্তু আমি ফল কি পাব, আত্মতত্ত্ব জেনে আমার কি ফল হবে? ঈশাবাস্যোপনিষদে ফলের কথা এইভাবে বলা হচ্ছে – *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক*, যিনি আত্মতত্ত্বকে জেনে যান তাঁর শোক আর মোহ নাশ হয়ে যায়। আত্মতত্ত্বের ফল কি হল? শোক আর মোহের নাশ। যখন বেদের কোন মন্ত্রকে আমি জেনে যাই তখন আমার কি ফল হবে? দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল লাভ। তার অর্থ হচ্ছে, টাকা-পয়সা, ঘর-বাড়ি, প্রমোশন, নাম-যশ এগুলো সব পাওয়াটা হচ্ছে দৃষ্ট ফল আর মৃত্যুর পর ভালো স্বর্গে যাওয়াটা হল অদৃষ্ট ফল। আর উপনিষদ জানার কি ফল? এখানে বলছেন তার কার্যের সাথে অবিদ্যার নাশ, অবিদ্যা থেকে যা কিছু বেরিয়েছে তারও নাশ হয়ে যায়। অবিদ্যার কার্য কি? শোক আর মোহ। কেউ আত্মতত্ত্বকে লাভ করেছেন আমরা কি ভাবে জানব? তার শোক আর মোহ নাশ হয়ে যাবে। মূল কথা তার মধ্যে কোন ধরণের চাঞ্চল্যতা থাকবে না, সব চাঞ্চল্যের নাশ হয়ে গেছে। শোক আর মোহ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, আমার প্রিয়জনের আসার কথা, সে এলো না তাই কাঁদছি, একজনের থেকে দূরে থাকতে চাইছি সে কাছে এসে গেছে বলে মনটা অস্থির হয়ে গেছে, এই শোক আর মোহ মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে চলেছে। কারুর মনের মধ্যে যে কোন ব্যাপারে যদি চাঞ্চল্যতা থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার আত্মতত্ত্ব লাভ হয়নি। আত্মতত্ত্ব লাভের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে শোক ও মোহের নাশ। শুধু শোক মোহেরই নাশ হয় না, শোক মোহের যে কারণ, অজ্ঞান আর অবিদ্যা, এই অজ্ঞান ও অবিদ্যারও নাশ হয়ে যায়। অজ্ঞান আর অবিদ্যার নাশ হলে কি হবে? তার মুক্তি লাভ হয়ে গেল, তাকে আর পুনর্জন্ম নিতে হবে না। পুনর্জন্ম তো অদৃষ্ট ফল, মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে গেলে কি গেলে না, তাতে আমার কি, আমি সামনা সামনি দেখতে চাই, হাতে নাতে ধরতে চাই। যজ্ঞ করলে হাতে নাতে ফল পাওয়া যাচ্ছে তখন লোকে যজ্ঞ করতে থাকবে, যজ্ঞ করে হাতে নাতে ফল পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, লোকে যজ্ঞ করা বন্ধ করে দিল। উপনিষদকে পালন করলে হাতে নাতে ফল। কি ফল? শোক আর মোহ তোমার চলে যাবে। গীতারও এই একই উদ্দেশ্য, শোক আর মোহের নাশ করা।

ষড়লিঙ্গমের পঞ্চম শর্ত হচ্ছে অর্থবাদ, অর্থবাদের অর্থ হচ্ছে প্রশংসা বা স্তুতি। কিসের স্তুতি? এই জ্ঞানের। ঈশা-বাস্যোপনিষদে কিভাবে এই জ্ঞানের স্তুতি করা হচ্ছে? তিন নম্বর মন্ত্রে স্তুতি করা হচ্ছে – *অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ*, আত্মতত্ত্ব জানা মানে অভেদ দৃষ্টি বা অভেদ জ্ঞান। অভেদ জ্ঞানের বিপরীত হচ্ছে ভেদ জ্ঞান। এখানে ভেদ জ্ঞানের নিন্দা করা হয়েছে। ভেদ জ্ঞানের নিন্দা যখন করা হয়েছে, তখন অভেদ জ্ঞানের প্রশংসা করা হল। অন্যান্য উপনিষদেও অর্থবাদ আছে, সেখানে সরাসরি অর্থবাদ করা হচ্ছে যেমন কোন উপনিষদে বলা হচ্ছে – যে ব্রহ্মবিৎ হন তাঁর কুলে কখনই অকর্মবিৎ হয় না, এগুলো হচ্ছে সরাসরি প্রশংসা। কিন্তু ঈশাবাস্যোপনিষদ পরোক্ষ ভাবে অর্থবাদ করে বলা হচ্ছে, যারা ভেদ দৃষ্টি সম্পন্ন তারা *অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ*। আমি আর তুমি আলাদা এই বোধ যদি আমার থাকে তাহলে আমাকে নরকে যেতে হবে। ভেদ ও অভেদ দৃষ্টি যথাক্রমে ব্যবহারিক সত্তাতে আর পারমার্থিক সত্তাতে।

ষড়লিঙ্গমের শেষ ও ষষ্ঠ শর্ত হল উপপত্তি। যুক্তি দিয়ে একটা তত্ত্বের তাৎপর্যকে বা তার অর্থকে নিরুপণ করা। এই উপনিষদে চতুর্থ মন্ত্রে একটা জায়গায় বলা হচ্ছে – *তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি*। অভেদ দৃষ্টিকে যখন আমি গ্রহণ করে নিলাম তখন তার যুক্তিটাও আপনা আপনিই এসে যাবে। যেমন, আমি বললাম স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের উপর খুব সুন্দর একটা স্তোত্র রচনা করেছেন। কি সেই স্তোত্র? *আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো*। তার মানে শ্রীরামকৃষ্ণ অভেদ দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তার logical conclusion টা কি? *আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো*, যাঁহার প্রেমস্রোত চণ্ডাল পর্যন্ত অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত। অভেদ দৃষ্টি না হলে এই জিনিষ কখনই হবে না। এটাকে বলা হচ্ছে উপপত্তি। এই হচ্ছে ষড়লিঙ্গ। এখন আচার্য এদেরই ষড়লিঙ্গ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ষড়লিঙ্গের অনুসারে ঈশাবাস্যোপনিষদ হচ্ছে বেদ। এই উপনিষদের একটাই বক্তব্য, তা হল – আত্মতত্ত্ব, এ ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যের প্রথমেই বলে দিলেন ঈশাবাস্যোপনিষদের মূল বক্তব্য কি।

এই উপনিষদের প্রথম শব্দ শুরু হচ্ছে *ওঁ ঈশা বাস্যমিদং* দিয়ে, উপনিষদের প্রথম শব্দ থেকে এর নাম দেওয়া হয়েছে ঈশাবাস্যোপনিষদ। কেনোপনিষদের নামও প্রথম মন্ত্রের প্রথম শব্দ থেকেই নেওয়া হয়েছে – *ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ*। ঈশাবাস্যোপনিষদ খুবই পুরনো, এত পুরনো যে আমরা কেউই বলতে পারবো না কত প্রাচীন। প্রাচীনত্ব নিরূপণে যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা উপনিষদের ভাষা ও বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে কিছু উপনিষদকে বলেন অতি পুরনো, কিছুকে বলেন পুরনো, আর কিছু উপনিষদকে পরবর্তি কালের উপনিষদ বলেন। পরবর্তি কালের মানে এই নয় যে এই উপনিষদ ইদানিং কালে রচনা করা হয়েছে, বাকি উপনিষদের মতই পুরনো কিন্তু অতটা পুরনো নয়। কেননা সব উপনিষদই তো একই সময়ে লেখা হয়নি, তাই বেশি পুরনো কম পুরনো হতে বাধ্য। বেদ উপনিষদকে আমরা মনে করি ভগবানের নিঃশ্বাস থেকেই এইগুলো বেরিয়েছে। ভগবানের নিঃশ্বাস থেকেই বেরুক, কেউ আপত্তি করবে না, কিন্তু ঋষিরা যখন যেমনটি দেখেছিলেন তখন তেমনটি তাঁর শিষ্যকে বলে গেছেন। ঋষিরা যখন যেমনটি দেখেছিলেন এই অর্থেই কোনটা অতি পুরনো, কোনটা পুরনো এই ভাবে বলা হচ্ছে। কিছু মন্ত্র আছে যেগুলো আগেকার দিনের ঋষিরা দেখেছিলেন, কিছু মন্ত্র পরের দিকের ঋষিরা দর্শন করেছিলেন। এইভাবে অতি প্রাচীন ও পরবর্তি কালের এই দুই ভাগে উপনিষদকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এর মধ্যে কিছু মন্ত্র আছে যেগুলো অতি প্রাচীন, এই মন্ত্রের শব্দগুলো পরের দিকে আর ব্যবহৃত হতো না বলে শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার করা খুব কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

ঈশাবাস্যোপনিষদে পরিষ্কার ভাবে দুই ধরণের অমরত্বের কথা বলা হয়েছে। যারা কর্ম করে বা উপাসনা করে বা কর্ম ও উপাসনা একই সাথে করে তাদের ক্রম-মুক্তির কথা বলা হচ্ছে, আর দ্বিতীয় মুক্তির কথা যেটা বলছে সেখানে পারমার্থিক মুক্তির কথাই বলা হচ্ছে। পৃথিবীতে যত দ্বৈতবাদের ধর্ম আছে যেমন খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুদাইজম্ আর সাধারণ হিন্দুধর্ম, আসলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যে ধারণা তার সাথে খ্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এদের সবারই উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি জগতের কাজ করে যাও আর ভগবানের উপাসনা ও পূজো কর, পারলে ভগবানের জপ-ধ্যান কর। মৃত্যুর পর তুমি রামকৃষ্ণলোকে বা বিষ্ণুলোকে কিংবা কোন উঁচু জায়গায় গিয়ে জন্ম নেবে, এটাই ক্রম-মুক্তি বা relative immortality। সাধারণ হিন্দুদের মতে, যারা এইভাবে ভগবানের নাম করে, ভালো কর্ম করে, মৃত্যুর পর পূণ্যানুসারে তারা বিভিন্ন স্বর্গে যায়, পূণ্যের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কিছু দিন পরে ঐখান থেকে পতন হয়ে তাদের আবার নীচে নেমে আসতে হয়। মুণ্ডকোপনিষদে এই জিনিষটাকে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পারমার্থিক মুক্তির ক্ষেত্রে বল হয়, এই মুক্তি পাওয়ার পর তাদের আর ফেরত আসতে হয় না, মানে তাদের আর শরীর ধারণ করতে হয় না। ঈশ্বর বা পারমার্থ সত্তার যে কল্পনা করা হচ্ছে সেই সত্তা একটাই, কিন্তু আপেক্ষিক জগতে এসে যত খুশি ঈশ্বর বা দেবতাকে বানিয়ে নেওয়া যায়, আল্লাকে রাখা যাবে, গড্‌কে রাখা যাবে, বিষ্ণুকে রাখা যাবে, যাকে খুশি রাখা যেতে পারে, তাতে বেদান্তের কোন সমস্যা হবে না। এর ফলে কি হয়, উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদ সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে নিতে পারে, বেদান্তের উচ্চতম আদর্শ অদ্বৈত বেদান্তকেও নিয়ে নিতে পারে আবার দ্বৈত বেদান্তকেও নিয়ে নিতে পারে। যত রকমের দেবী দেবতাকে, ভগবানকে রাখতে চাইলে রাখতে পারি, যত রকমের কর্ম রাখতে চাইলে সবটাই রাখা যাবে, কোনটার সাথে কোন বিরোধ নেই।

আচার্য শঙ্কর ভাষ্যেই বলে দিচ্ছেন কোন যজ্ঞেই এই উপনিষদের মন্ত্রগুলোকে সরাসরি ব্যবহার করা হয় না। এই নিয়মটা শঙ্করাচার্যের সময়েই বেঁধে দেওয়া হয়নি, শঙ্করাচার্যেরও অনেক অনেক আগে থাকতেই পরম্পরাতে ঠিক করা হয়ে আছে যে এর মন্ত্রগুলো যজ্ঞে ব্যবহৃত হবে না, যদিও একে যজ্ঞে ব্যবহার করার কথা। কিছু কিছু যজ্ঞে এই উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে মন্ত্রপাঠ ও স্তুতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথম মন্ত্র হচ্ছে –

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।১

প্রথম মন্ত্রের ভাষ্য রচনার ঠিক আগে আচার্য শঙ্কর একটা সম্বন্ধ ভাষ্য দিচ্ছেন। শুরুতে তিনি বলছেন, শুক্লযজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র কখনই কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয় না। এই নিয়ম আমরা যে আচার্য শঙ্করের বক্তব্যের মধ্যেই প্রথম পাচ্ছি তা নয়, প্রথম থেকেই ঠিক হয়ে আছে যে, এই মন্ত্র কোন ধরণের কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়

না। আচার্য এইখান থেকেই কর্মকাণ্ডীদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করবেন – তোমরা যে এই মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহার কর না, তা তোমরা ঠিকই করছ, ভুল কিছুই করছ না। যেমনি এই মন্ত্রগুলো যজ্ঞে ব্যবহার করা হবে তখনই কিন্তু এটা আর উপনিষদ রূপে গণ্য করা যাবে না। কারণ এই মন্ত্রগুলি কখন যজ্ঞাদি সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করছে না। তাহলে কি আলোচনা করছে? আত্মা ঠিক যেই রকম, আত্মার স্বরূপ যে রকমটি, ঠিক সেই রকমটি প্রকাশ করে আত্মার স্বরূপকে আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। যে জিনিষ আত্মার স্বরূপকে সামনে নিয়ে আসছে তাকে কখনই যজ্ঞে ব্যবহার করা যায় না। আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে আত্মার কথা বলা হচ্ছে, যজ্ঞে ব্যবহার করা যাবে না ইত্যাদি ব্যাপার গুলোর কি এমন গুরুত্ব? কিন্তু এই ব্যাপারটা এতই গুরুত্ব যে এর গুরুত্বকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে পুরো দর্শনটাই অন্য দিকে নিয় গিয়ে বেদান্তকে দুর্বল করে দেবে।

আত্মার স্বরূপটা কি রকম? আচার্য বলছেন – শুদ্ধত্ব, আপাপবিদ্ধত্ব, একত্ব, নিত্যত্ব, অশরীরত্ব, সর্বগতত্ব ইত্যাদি। আচার্য পরে বলবেন – আত্মার কি কি গুণ – একেবারে শুদ্ধ, নিষ্পাপ, একমাত্র আত্মাই আছে, একত্ব কেবলম্, আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। এক বলতে এখানে বলছেন অদ্বিতীয়। নিত্যত্ব, আত্মা চিরকাল ধরে আছেন, অশরীররত্ব, আত্মার কোন শরীর নেই। আত্মার এই যথার্থ স্বরূপ যদি এই হয় তাহলে একে কখনই কর্মে ব্যবহার করা যেতে পারেনা। কেন ব্যবহার করা যাবে ন? তখন বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়, যে কোন যজ্ঞে তিনটে জিনিষ লাগে – ১) কর্তা, যে যজ্ঞ করবে, ২) কর্ম, কর্ম এখানে দ্বিতীয়া আর ৩) ক্রিয়া। তার সাথে যজ্ঞে যে জিনিষগুলো ব্যবহার করা হবে, সেগুলোর সব সময় চারটি বৈশিষ্ট্য থাকবে – ১) উৎপাদ্য, যেটাকে তৈরী করা হয়, যেমন পুরোডাস, সত্যনারায়ণ পূজোতে যেমন সিন্নি তৈরী করা হয়, পুরোডাস অনেকটা ঐ রকম, যজ্ঞের জন্য পুরোডাস তৈরী করতে হবে। ২) বিকার্য, সোমরস তৈরী করার জন্য সোমপাতাকে পিষে পিষে রস তৈরী করে সেই রসটাকে পচান হয়, ঐ রসের একটা বিকার আসে। ৩) আপ্য, যেটা দিয়ে কোন কিছুকে পাওয়া যায়, যেমন বলা হচ্ছে এই মন্ত্র পাঠ করলে তুমি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কোন কিছু পাবে এবং শেষে ৪) সংস্কার্য, যজ্ঞের নৈবেদ্য ও আনুষাঙ্গিক রূপে যা কিছু ব্যবহার করা হবে সেগুলো আগে থাকতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে কিছু উপাচারের দ্বারা সংস্কার করে শুদ্ধ করা হয়, এই কার্যগুলোকে বলা হয় সংস্কার্য। এর সাথে লাগছে কর্তা, ভোক্তা আর কর্ম। একটা যজ্ঞ করতে এত কিছুর উপকরণের দরকার হচ্ছে। আত্মার এগুলোর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, কোন সম্বন্ধও নেই। আত্মা আপ্য নয়, কারণ আত্মা কোথাও নিয়ে যাবে না, সংস্কার্য নয়, কারণ আত্মা সব সময় শুদ্ধ, যে শুদ্ধ তাকে আর কিভাবে শুদ্ধ করবে, আত্মা উৎপাদ্য নয়, কারণ আত্মা চিরন্তন, আর আত্মা বিকার্য নয়, কারণ আত্মার কোন বিকার নেই। আত্মা আর সাধারণ যজ্ঞের তফাৎ এইটাই। এখন আমি যদি বলি আমি আমার আত্মাকে পরমাত্মাতে আহুতি দিচ্ছি, এই অর্থে তো যজ্ঞ হয়ে গেল। না, তা হবে না, যজ্ঞে যা লাগে তার চারটে আনুষাঙ্গিক শর্ত লাগে – উৎপাদ্য, তুমি একটা জিনিষকে জন্ম দেবে, কিন্তু আত্মাতো আগে থাকতেই আছে, আত্মাকে কি করে জন্ম দেবে, বিকার্য, সোমরসে যেমন বিকার আসে, আত্মারতো বিকার কিছু হবেই না, আপ্য, আত্মা কোথাও কাউকে পোঁছে রেখে আসবে না আর সংস্কার্য, যে নিত্যশুদ্ধ তাঁকে আর তুমি কি শুদ্ধ করবে। তার সাথে যজ্ঞে কর্তা ও ভোক্তা থাকবে, আত্মা কর্তাও নয় ভোক্তাও নয়। আর কর্ম, আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মাই আছেন, আত্মা কার উপর কর্ম করবেন, কর্ম করতে দুই দরকার, আত্মা অদ্বিতীয়। শেষে আসছে ক্রিয়া, যার উপর কর্মই করা যাচ্ছে না তাহলে ক্রিয়া আর হবে কি করে। সব দিক থেকে এটা নশ্যাৎ হয়ে গেল।

এই মতটা বেদান্তের। কিন্তু মীমাংসকরা আবার এই মতকে মানবে না। মীমাংসকরা বলে, আমার শরীরে, তোমার শরীরে, সমস্ত প্রাণীর শরীরে ছোট্ট অনুর আকারে বা টেনিস বলের মত আত্মা আছেন। এই আত্মা শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে বসবাস করতে করতে, ধর্ম ও অধর্মের ফাঁদে পড়ে অশুদ্ধ হয়ে যায়। তখন তাঁকে কি করতে হবে? সাধনা করে করে ঘষে মেজে এই অশুদ্ধ আত্মাকে শুদ্ধ করতে হবে। তখন আবার আত্মার মধ্যে উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ও সংস্কার্য এগুলো এসে যায়। তার মানে আত্মা হয়ে গিয়েছিলেন অশুদ্ধ, সেই অশুদ্ধ আত্মাকে আমি শুদ্ধ করলাম। এই যুক্তিকে দাঁড় করাবার জন্য মীমাংসকরা দেখাবে একটা লোক পাপী, একটা লোক চোর, সেই চোর বা পাপী থেকে সে আবার সাধু হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তার আত্মার সংস্কার করা হচ্ছে। এখানে এসে আচার্য আবার মীমাংসকদের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি কে নিয়ে এসে তুলোধুনো করবেন। অন্যান্য জায়গায় যেমন বলা হয়েছে, সেইভাবে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ঐভাবে হবে না। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আমার সামনের লোকটি কত বড় পণ্ডিত, সেই তুলনায় আমি কিছুই নই, এটাকে কি করে মেলান যাবে। আচার্য এই জিনিষটাকেই ব্যাখ্যা করবেন। আত্মার একটা অবস্থা হচ্ছে নিরুপাধিক, যাঁর কোন উপাধি নেই, এটাই আসল সত্তা তাঁর, যেখানে আত্মা হচ্ছেন অশরীরী, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নিত্য, সর্বগত ইত্যাদি। কিন্তু যখন আত্মা শরীরের সাথে নিজেকে

জুড়ে দেয় তখন সে মনে করছে আমি পণ্ডিত, আমি মুর্খ, আমি অমুক ব্যক্তি। মীমাংসকদের আচার্য বলছেন, তুমি যে বিকারের কথা বলছ সেটা ঠিকই বলছ, কিন্তু এই বিকারটা বাস্তবিক নয়, এর পুরোটাই কাল্পনিক। কল্পিত বস্তুকে সরানোটা সরান হতে পারেনা।

আচার্য বলছেন, বেদে যে কর্মের কথা বলা হয়েছে, যারা নিজের আত্মাকে শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে রেখেছে তাদের জন্যই বেদের এই কর্মের বিধান। কিন্তু যাঁরা আত্মার স্বরূপকে বুঝে গেছেন, আত্মার স্বরূপে অবস্থান করে আছেন তাঁদের জন্য বেদের কোন কর্মবিধান প্রযোজ্য হতে পারেনা। আচার্য বলছেন – বেদ সবারই জন্য, মানে উপনিষদে যে কথা গুলো বলা হয়েছে এই কথা সবারই জন্য, আত্মার কথা সবারই জন্য। কিন্তু যাঁরা বেদের যজ্ঞ করেন তাঁদেরকে অনেক কিছু নিয়মের মধ্যে বেঁধে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়, যেমন আমি দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য বা আমি শূদ্র, আমি কানা নয়, আমি কুঁজো নয়। যারা কানা, কুঁজো বা যাদের শারীরিক কোন বিকলাঙ্গ আছে তাদের যজ্ঞ করার অধিকার নেই, অন্য দিকে শূদ্রেরও যজ্ঞে অধিকার নেই। এই নিয়মগুলো মীমাংসকরাই বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু এইখানে যে আত্মতত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে এখানেতো কোথাও বলা হচ্ছে না যে, যারা দ্বিজাতি নয় বা যারা কানা খোঁড়া তাদের এই আত্মতত্ত্বকে জানার অধিকার নেই। তাহলে, এখানেই তোমার আর আমার পথ আলাদা হয়ে গেল। যজ্ঞে অধিকার কার? যারা দ্বিজাতি, যারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ। উপনিষদে অধিকার কার? সবার। এইখানে এসেই পথ পুরো আলাদা হয়ে গেল। উপনিষদ কখনই বলবে না, উপনিষদ মেয়েদের জন্য নয়, বলবে না যে, উপনিষদ কানা খোঁড়াদের জন্য নয়। উপনিষদ কখনই বলবে না উপনিষদ শূদ্রের জন্য নয়। কিন্তু যখনই কেউ যজ্ঞ করতে চাইবে তখনই তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি ব্রাহ্মণ? না তো, আমি সন্ন্যাসী। আপনি তাহলে যজ্ঞের কাছেই দাঁড়াবেন না, যজ্ঞের বাইরে চলে যান। এরপর আরেকজন যাবে যজ্ঞ করার ইচ্ছে নিয়ে, তখন তাকেও প্রশ্ন করা হবে আপনি কি ব্রাহ্মণ? হ্যাঁ, আমি কুলিন ব্রাহ্মণ। তখনই তাকে সাদর আপ্যায়ন করে যজ্ঞস্থলে নিয়ে যাবে, আমরা তো আপনার জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম। আচার্য শঙ্কর এই ব্যাপারটাকেই তুলে নিয়ে বলবেন – তোমরাইতো বল যজ্ঞ করতে গেলে এই এই শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। তার মানে যজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু উপনিষদে কোন ধরণের সীমাবদ্ধতা নেই। আত্মতত্ত্ব জানার অধিকার সবারই আছে, কারণ আত্মা সবারই আছে, তোমরাইতো বলছ সবার মধ্যেই আত্মা আছেন। উপনিষদে যে বলা হচ্ছে আত্মা সর্বব্যাপী, সেটাতো তুমিও বলছ, তাহলে তুমি যে শূদ্রকে বাদ দিয়ে দেবে, মহিলাকে বাদ দিয়ে দেবে, ম্লেচ্ছকে বাদ দেবে, কানা খোঁড়াকে বাদ দেবে, আত্মাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেটাতো হবে না। তুমি তো নিজেই পরস্পর বিরোধী কথা বলছ। তার মানে গিয়ে দাঁড়াল এই মন্ত্র কোন মতেই, কোন ভাবেই যজ্ঞে ব্যবহার হতে পারেনা। আচার্য শঙ্কর পুরোপুরি চিরদিনের মত সিদ্ধ করে দেখিয়ে বলে দিলেন – শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতায় চল্লিশতম অধ্যায়কে কোন মতেই কর্মকাণ্ড বা সংহিতা হিসাবে নেওয়া যাবে না এবং যজ্ঞ রূপে যে এটা ব্যবহার করা হয় না, ঠিকই করা হয়।

যজ্ঞ আর কর্ম মূলতঃ একই। যাঁরা জ্ঞানী, আত্মতত্ত্ব জেনে গেছেন, তাঁরাও কাজ করেন কিন্তু তাঁদের কাজ করার সাথে আর সাধারণের কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকে। জ্ঞানী যখন কাজ করেন তখন তিনি জানেন যে আমার আত্মা কিন্তু কোন কাজ করছে না, ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে কিন্তু অজ্ঞানীরা যখন কাজ করে তখন তারা দেখে আমার আত্মাই কাজ করছে, এইটুকুই তফাৎ। ঈশাবাস্যোপনিষদের আঠারোটা মন্ত্র আত্মার যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করছে, এইটাই হচ্ছে এই উপনিষদের বিষয়। ঈশাবাস্যোপনিষদ বক্তব্য হচ্ছে আত্মার যথার্থ স্বরূপতার প্রকাশ। আত্মার স্বরূপকে প্রকাশ করে কি করছে? স্বাভাবিক অজ্ঞান নিবৃত্তি, জন্ম-জন্মান্তর থেকে আমাদের মধ্যে যে অজ্ঞান চলে আসছে, যে অজ্ঞানতা আমাদের মনের মধ্যে স্থায়ী ভাবে বসে আছে, এই স্বাভাবিক অজ্ঞানকে আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের মাধ্যমে নাশ করে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে সাথে কি করে? এই অজ্ঞান ও অবিদ্যার যে কার্য, কি কার্য? শোক আর মোহ। এই সংসারে যে শোক আর মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেটাকে বিচ্ছেদ করে দেয়। এইগুলো করার ফলে কি হয়? আত্মৈকত্ব, এক আত্মাই আছেন, এই বিজ্ঞান তখন উন্মোচন হয়ে যায়।

এইটাই অনুবন্ধ চতুষ্টয়। যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ণ করার আগে চারটে জিনিষকে বুঝে নিতে হয় – ১) বিষয়, যে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে যাচ্ছি সেই শাস্ত্র কি বিষয় সম্বন্ধে বলতে চাইছে। ২) অধিকার, এই শাস্ত্র পাঠ করতে গেলে কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে। ৩) সম্বন্ধ আর ৪) প্রয়োজন, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমার কি লাভ হবে। ঈশোপনিষদের বিষয় হচ্ছে – আত্মার যথার্থ স্বরূপ। সম্বন্ধ, এই স্বরূপকে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে এইটাই সম্বন্ধ। এতে আমার কি লাভ হবে,

কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? আত্মার বিজ্ঞানকে জেনে নিলে দৃষ্টের দিক থেকে আমার শোক মোহ চলে যাবে আর অদৃষ্টের দিক থেকে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। কে এই উপনিষদের পাঠের অধিকারী, যারাই আত্মতত্ত্বকে জানতে চান তাদের জন্যই এই উপনিষদ। এখন যদি কোন মডার্ন ম্যানেজমেন্টের ছাত্র এসে বলে আমি ঈশাবাস্যোপনিষদের উপর পড়াশোনা করে চিন্তা ভাবনা করতে চাই। তখন তাকে বলা হবে – ভাই এটা পড়ার ঠিক ঠিক অধিকারী হচ্ছেন যিনি আত্মতত্ত্বকে জানতে চাইছেন, তুমি কি তাই চাইছ? না না, আমি তো অর্থতত্ত্ব জানতে চাই, কিভাবে আরও বেশি টাকা আয় করা যায় এইটা জানতে চাই। তাহলে ভাই এটা তোমার জন্য নয়।

আচার্য শঙ্কর বলছেন – ঈশাবাস্যোপনিষদে দুটো নিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে – জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্মনিষ্ঠা। প্রথম মন্ত্রটিতে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রটি সন্ন্যাসীদের জন্য। কোন গুরুর কাছে দুজন শিষ্য এসেছে। গুরু দুই শিষ্যকে দেখে বলছেন – খুব ভালো তোমরা এখানে এসেছ, তা তুমি কি সন্ন্যাসী হতে চাও? হ্যাঁ আমি সন্ন্যাসী হতে চাই। ঠিক আছে, তাহলে তুমি এই মন্ত্রটা পালন কর – *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্*।। দ্বিতীয় শিষ্যকে এই একই প্রশ্ন করার পর সে বলছে – না আমি সন্ন্যাসী হতে চাইনা, আমি এখনও সংসারে সুখ ভোগ করতে চাই। গুরু তখন তাকে বলবেন, তাহলে তুমি ঈশাবাস্যোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রটা পালন করতে থাক – *কুর্বন্নেবহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে*।। আচার্য এখানে একেবারে খুব গোঁড়া, প্রথম মন্ত্রটা হচ্ছে বিবিদীষ সন্ন্যাসীর জন্য। বিবিদীষ সন্ন্যাস হচ্ছে, যিনি শাস্ত্র কথা শুনে সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এখনও তিনি জ্ঞান লাভ করে বিজ্ঞানী হননি। কিন্তু কোথাও কোথাও এই ধরণের সন্ন্যাসীকে আচার্য বলছেন আত্মবিৎ, ইনি আত্মজ্ঞানী। এই ব্যাপারে আচার্য শঙ্কর বলছেন, জাত সাপের বাচ্চা জাত সাপই হয়। কেউটে সাপের বাচ্চারও সমান বিষ। আচার্য এই ব্যাপারে খুব পরিষ্কার, যার মনে সন্ন্যাসের ভাব এসে গেছে, সে আত্মতত্ত্ব না জেনে থাকুক, কিন্তু সে আত্মবিৎ। গীতাতেও এই একই কথা বলা হয়েছে। আত্মজ্ঞানের পথিককেও উপলব্ধিবান বলেই আচার্য মনে করছেন।

যিনি শাসন করেন, যাঁর দ্বারা শাসন হয় তাঁকে বলা হয় ঈশা। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কার দ্বারা শাসিত হচ্ছে? ঈশা। *ঈশা বাস্যমিদং*, বাস্যম্ মানে আচ্ছাদন করতে বলা হচ্ছে। ঈশা, তিনি কিন্তু আমার ভেতরেও আছেন, সেখানে থেকে আমাকে চালিত করছেন, আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেও তিনিই আছেন, এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আচার্য কেন বলছেন এই দুটোতে তফাৎ নেই, সেটা বুঝতে গেলে আমাদের পরের দিকের মন্ত্রে যা বলা হবে সেটার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে, যখনই উপনিষদকে বুঝতে চাইব তখন সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে একসাথে নিয়ে এগোতে হবে। তা নাহলে এর ভাব ও অর্থ আমাদের মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে। সামগ্রিক ভাবটাকে একসাথে না নিয়ে এগোলে মনে হবে একটা মন্ত্রে এই রকম বলা হল, আরেকটা মন্ত্রে গিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্য রকম কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আসলে পরস্পর বিরোধী কোন কথাই বলা হবে না। আত্মার স্বরূপ পরে বলা হবে, সেই স্বরূপকে মাথায় রেখে এখানে বলছেন – যিনি তোমার ভেতরে বসে তোমাকে চালাচ্ছেন তিনিই আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে চালাচ্ছেন, তাঁরা দ্বারাই সব কিছুকে আচ্ছাদন কর। মানে তাঁকেই সব সময় চিন্তা কর, কারণ তিনিই একমাত্র আছেন, শুদ্ধ আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই। এই চিন্তাটা সব সময় মনের মধ্যে ঘোরাতে থাক আর তোমার চেতনাকে এই চিন্তাতে জাগ্রত করে রাখ।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এই জগতে যা কিছু আছে, স্থাবর হোক বা জঙ্গমই হোক, আমার ভিতর যে প্রত্যগাত্মা আছেন তিনিই আবার সর্বব্যাপী, তিনিই সেই শুদ্ধ আত্মা, তিনি আর ইনি আলাদা কিছু নন। তিনিই আবার ঈশা, মানে তিনিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তাই ঈশ্বর, আত্মা আর ব্রহ্ম তিনটেই এক। আত্মা আর ঈশ্বর এক এই ভাবটাকে সব কিছুর উপর আরোপ করে চলতে হবে। এই টেবিল, টেবিলের উপর যে বোতল এগুলোর মধ্যেও ঈশ্বরের ভাবকে নিয়ে আসতে হবে, এটাও ঈশ্বরের একটি রূপ, এই রূপেও তিনি আছেন। এই ভাবটা তোমাকে আনতে হবে, কারণ তুমি এখনও আত্মজ্ঞানী হওনি, গুরুর কাছে শিষ্য রূপে তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করতে এসেছ। গুরু তাকে বলছেন তুমি এই রকমটি সাধনা কর। এখানে আত্মতত্ত্বের কথা বলছেন না, যিনি আত্মবিৎ তিনি কি রকম দেখছেন বলা হচ্ছে না, তোমার এই রকমটি করা উচিৎ, তুমি এই রকমটি কর। কি করতে বলছেন? সব কিছুর মধ্যে আগে ঈশ্বর জ্ঞানকে আরোপ কর। এই ভাবটাই পরে স্বামীজী বলছেন জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এবং সত্যিই করছেন, আচার্য এখানে বলছেন – *প্রত্যগাত্ম ত্বয়া অহমেকমিদং সর্বং*, শুদ্ধ আত্মা রূপে আমিই এই সব কিছু, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। তাই বলে আমি

আর আপনি এক নই, এই ভুলটা সবাই করে বসেন। কিভাবে এক? *প্রত্যগাত্ম ত্বয়া,* আত্মার দিক থেকে আমি আপনি এক কিন্তু শরীরের দিক থেকে এক নই।

এরপর আচার্য একটা উপমা নিয়ে আসছেন। চন্দন, অগরু, এই জিনিষগুলি যখন অনেক দিন জলের সংসর্গে থাকে তখন তাতে দুর্গন্ধ এসে যায়। চাল থেকে ভাত হয়, সেই ভাতকে যদি অনেক সময় ধরে জলে ভিজিয়ে রাখা হয় তাহলে ভাতের মধ্যে বিকার এসে যাবে, তখন এই ভাতই হাড়িয়া হয়ে যাবে। চন্দন আর অগরুর স্বাভাবিকত্ব হচ্ছে সুগন্ধ, কিন্তু জলের সংসর্গে থেকে তাতে এসে গেল দুর্গন্ধ। আত্মার স্বরূপত্ব কী? নিত্যত্ব, সর্বগতত্ব, শুদ্ধত্ব ইত্যাদি, সেই আত্মা শরীরের সংসর্গে এসে সঙ্কুচিত ও আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আত্মা অনন্ত কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সীমিত ও সঙ্কুচিত। কিভাবে হচ্ছে? যেমন জলের সংসর্গে থেকে চন্দনে দুর্গন্ধ এসে যায়। তুমি সেই শুদ্ধ, অনন্ত, সর্বব্যাপী আত্মা কিন্তু অবিদ্যার সাথে নিজেকে জুড়ে দিয়ে তুমি হয়ে গেছ সান্ত, সীমিত। চন্দন আর অগরুর গন্ধকে এখন কিভাবে সুগন্ধে নিয়ে আসতে হবে? চন্দনকে ঘষতে থাক। চন্দনকে ঘষতে থাকলে, ওর মধ্যে যে অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ, যেটা ওপর থেকে এসেছে, সেটা চলে যাবে। দুর্গন্ধটা চলে গিয়ে চন্দনের ভেতরে যে স্বাভাবিক সুগন্ধটা আগে থাকতেই বিদ্যমান আছে সেটা বেরিয়ে আসে। ঠিক সেই রকম, এই যে পরমার্থ সত্য স্বরূপ আত্মা, এই ভাবনাকে নিয়ে আসতে হয়। এই ভাবনাকে নিয়ে পড়ে থাকলে কি হয়? এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রূপ জগৎ সংসার, এই সংসারের প্রতি আসক্তিটা খসে পড়ে যায়। সংসারের প্রতি আসক্তিটা হল বিকার, মানে চন্দনের দুর্গন্ধ।

আমি এবার নিজেকে ঘষতে শুরু করব। কোথায় ঘষব? *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং* এই ভাবটাকে অবলম্বন করে সব কিছুতে সব সময় এই ভাবটাকে আরোপ করতে থাকাটাই ঘষা। তখন কি হবে? বাইরে থেকে যে দুর্গন্ধটা এসেছে সেটা দুরীভূত হয়ে যাবে। দুর্গন্ধটা বেরিয়ে কে বেরোবে? ভেতরে যেটা আছে। ভেতরে সেই নিত্য, শুদ্ধ, অনন্ত আত্মাই আছেন। এখানে এসে মীমাংসক আর বেদান্তের পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মীমাংসকরা বলবে, তুমি পাপকর্ম করেছ তাই তোমার এই পরিণতি, তুমি এখন ঘষা মাজা করলে একটা ভালো কিছুতে পরিণত হয়ে যাবে। একটা কাঠ আছে, কাঠকে নানা ভাবে সংস্কার করার পরে কাঠটা একটা সুন্দর চেয়ার হয়ে গেল। বেদান্তীরা বলবে, না না, চেয়ারটা ঐ কাঠের মধ্যেই ছিল। একটা পাথরের মুর্তি যখন গড়া হয় তখন আমরা বলি, পাথরটাকে ছেনি দিয়ে কেটে কেটে এই মুর্তিটা গড়া হয়েছে। কিন্তু অন্য ভাবেও বলা যায়, মুর্তিটা পাথরেই ছিল, পাথরের অবাঞ্ছিত অংশটাকে সরিয়ে দেওয়ার পর সুন্দর মুর্তিটা বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে আদপেই এই ধরণের কিছু হয় না। একমাত্র আত্মার তুলনা হতে পারে চন্দনের সঙ্গে। চন্দনকে জলে অনেক দিন ফেলে রাখলে চন্দনে দুর্গন্ধ এসে যাবে। কিন্তু স্বাভাবিকত্বটা যাবে কোথায়, ঐ দুর্গন্ধতেই ঢাকা পড়ে আছে। দুর্গন্ধ রূপী অবিদ্যাকে নাশ করতে হয়। কিভাবে নাশ করতে হবে? পরমার্থ তত্ত্বে ঘষা মাজা করতে হবে, প্রত্যগাত্মা রূপে আমিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতে আছে। এই ভাবনাকে নিয়ে দিন রাত পড়ে থাকতে থাকতে অবিদ্যাটা খসে যায়। এটাকেই স্বামীজী বলছেন – শ্রীরামকৃষ্ণ মুশা। স্যাকরাদের দোকানে একটা বাটি থাকে, বাটিতে এ্যাসিড থাকে, সেই বাটিতে সোনা বা রূপার গয়নাগুলোকে ফেলে দিয়ে ঘষতে থাকে। তাতে সোনার ময়লাটা বেরিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মুশা মানে, শ্রীরামকৃষ্ণের যে ব্যক্তিত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব, এই ভাবের মধ্যে নিজেকে ফেলে দিয়ে ঘষা মাজা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ মুশাতে ঘষা মাজা করলে আমার ভেতরের ময়লা গুলো পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আত্মার জ্যোতি নির্গত হতে থাকবে। আচার্য ঠিক এই কথা বলছেন।

প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন – *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা*। এই জায়গাটাতে এসে মন্ত্রের অর্থটা আবার খুব কঠিন হয়ে যায়। *ত্যক্তেন* মানে ফেলে দেওয়া, আর *ভুঞ্জীথা* মানে ভোগ করা। একটা জিনিষকে ফেলে দেওয়া হয়ে গেলে ভোগ করবে কিভাবে? আচার্য এখানে বলছেন, আপনার বাড়ির চাকরকে যদি বরখাস্ত করে বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিলেন তাহলে আপনি তার থেকে সেবা নেবেন কিভাবে? স্বামীই যদি মরে যায় স্ত্রী সেই স্বামীর থেকে ভোগ করবে কিভাবে? সেইজন্য ত্যক্তেনর অর্থ ফেলে দেওয়া এখানে হতেই পারেনা। তাহলে কি অর্থ হবে? ত্যাগেন, ত্যাগের দ্বারা। এই জায়গাগুলো খুব জটিল। সংস্কৃত ভালো জানেন কিন্তু আচার্যের ভাষ্য পড়া নেই, এই ধরণের পণ্ডিতরা এই মন্ত্রের অর্থ বার করতে গিয়ে একেবারে গোলমাল করে বসবেন। আচার্যের ভাষ্য পড়া আর তার সাথে উপনিষদের পুরো বক্তব্যের সামগ্রিক চিত্রটাকে মাথার মধ্যে না বসিয়ে রাখলে মন্ত্রের অর্থ পুরো উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। ঈশাবাস্যোপনিষদের সংস্কৃত খুবই পুরনো, এখানে ত্যক্তেন হবে না, হবে ত্যাগেন, ত্যাগের দ্বারা। কি ত্যাগ? পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা, সন্তানের

ইচ্ছা, অর্থ সম্পদের ইচ্ছা আর স্বর্গাদির ইচ্ছা। এই তিনটে এষণাকে ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে। ত্যাগ করে কি করতে হবে? *ভুঞ্জিথা,* ভোগ করে। কিন্তু জগৎ কি করে ভোগ করবে, কেননা এখানে প্রথম অংশে বলছেন আত্মতত্ত্ব দিয়ে সব কিছুকে আচ্ছাদিত করতে হবে। তার মানে এই যে বোতলটা এখানে আছে, এই বোতলের মধ্যেও আমাকে ঈশ্বর তত্ত্ব আনতে হবে। তারপর বললেন ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। কিন্তু ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে গেলে বোতলটা বোতল জ্ঞানেই ভোগ হয়ে যাবে। বোতল জ্ঞান না হলে বোতলের ভোগ হবে না। তাহলে ভুঞ্জিথার অর্থ এখানে ভোগ করা হবে না, পালন কর এই অর্থেই ভুঞ্জিথা হবে। যারা বৈয়াকরণ, তারা শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না, তারা তখন ব্যকারণের নিয়ম অনুযায়ী দেখাবেন এই শব্দের ধাতু এই, এই ধাতুতে এই শব্দের এই অর্থ হয়, সেই কারণে আচার্য যেটা বলছেন, ভুঞ্জিথা মানে পালন করা, এই অর্থ ঠিকই আছে। পালন করা মানে, ঐ ভাবটাকে জাগিয়ে রাখ। কোন ভাবটাকে? আত্মতত্ত্ব ভাবকে। কি দিয়ে জাগিয়ে রাখবে? ত্যাগের দ্বারা। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণাকে ত্যাগের দ্বারা ঐ ভাবটাকে জাগিয়ে রাখ। গীতাতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু,* পুত্র, স্ত্রী, গৃহ এই সবের প্রতি যে আসক্তি আর অভিসঙ্গি এইটাকে ত্যাগ কর। এই সংসার ত্যাগ করে কি করবে? পালন কর, এই আত্মতত্ত্ব ভাবকে পালন কর। তখনই তোমার ঠিক ঠিক সন্ন্যাসের দিকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মা গৃধঃ, মা মানে না, *গৃধঃ* মানে লোভ, তুমি লোভ করো না। কিসে লোভ করবে না? *কস্য স্বিদ্ধনম্,* অনেক প্রাচীন সংস্কৃত বলে এখানেও দুই রকমের অর্থ এসে যায়। নিজের ধন বা অপরের ধন, কোন দিকেই লোভ করো না। নিজের ধন সম্পদকে সামলে রাখছি আর পরের ধন সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেব। না, তাও নয়। আবার নিজের ধন উড়িয়ে দিচ্ছি আর পরেরটা লুট করে নিচ্ছি, তাও নয়। কোন দিকেই লোভ করবে না। নিজের সম্পদের প্রতিও আসক্তি থাকবে না, অপরের সম্পদের প্রতিও লোভ থাকবে না। আরেকটা অর্থ হতে পারে – আত্মতত্ত্বের দিকে যখন কেউ অগ্রসর হচ্ছে তাকে এই বিচার ধারা আনতে হবে, তুমি মরে গেলে টাকা-পয়সা, ঘর-বাড়ি কার থাকবে, মরার পর তুমিও দেখতে আসবে না কে এই ধন সম্পদ ভোগ করছে। সেইজন্য এগুলোর প্রতি আসক্তি করে কি হবে? মূল বক্তব্য হল, তুমি যদি সন্ন্যাস ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাও, আত্মতত্ত্ব যদি তুমি জানতে চাও, আর শান্তি যদি জীবনে তুমি পেতে চাও তাহলে তুমি কি করবে? *ঈশা বাস্যমিদং,* সব কিছুতে ঈশ্বর ভাব মানে আত্মতত্ত্ব ভাব নিয়ে আসবে। এই ঈশ্বর ভাবের, আত্মতত্ত্ব ভাবের বাইরে কোন কিছুকেই বাদ দেওয়া যাবে না। একটা মজার গল্প আছে, বিহারের এক নেতা ভাষণ দিচ্ছেন – ভাইয়ো ঔর বহিনো, বলেই বলছে, মুন্নিকে মাকো ছোড়কর। ভাই আর বোনেরা বলার পর বলছে, মুন্নির মাকে বাদ দিয়ে, নিজের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে বলছেন কারণ নিজের স্ত্রীকে বোন বললে তো গোলমাল হয়ে যাবে। এখানে বলছেন, একটুখানি বাদ দিয়ে তুমি পাটোয়ারি করবে তা করা চলবে না, সব কিছুতেই *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*। সব কিছু ঈশ্বরেরই একেকটি রূপ, তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ। *কস্য স্বিদ্ধনম্,* টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ কারুরই নয়। অর্থাৎ বলতে চাইছেন, নিজের সম্পদ, নিজের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ কোন কিছুরই প্রতি আসক্তি রাখবে না। নিজের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি না হয় রাখলাম না, অপরের স্ত্রীর প্রতি কি আসক্তি করা যাবে? না, তাও না। *কস্য স্বিদ্ধনম্* কারুর দিকেও না, নিজেরটার প্রতিও না অপরের কারুর কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি দেবে না। প্রকৃত যিনি সন্ন্যাসী তাঁকে এটাই করতে বলা হচ্ছে। যাঁরা সন্ন্যাসের ভাবকে অবলম্বন করতে চাইছে তাদের জন্যই এই মন্ত্র। মূল কথা হল, সব কিছু ত্যাগ কর, ত্যাগ করে আত্মতত্ত্বের ভাবটাকে জাগ্রত রাখ, এইটাই হচ্ছে সন্ন্যাসীদের পথ আর এটাই প্রথম মন্ত্রের মূল ভাবার্থ।

কিন্তু যারা আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করতে পারছে না, ভেতরে শ্রদ্ধা আছে, আত্মতত্ত্বের ব্যাপারে খুব আগ্রহও আছে, কিন্তু সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করতে পারছে না, সন্ন্যাসে অসমর্থ, তাদের জন্য বলা হচ্ছে –

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।২

যারা বলছে আমি সন্ন্যাসের ব্যাপারে অসমর্থ, কিন্তু আমি একটা ভালো জীবন যাপন করে উচ্চ অবস্থায় যেতে চাইছি। যে বলছে ভাইয়ো ঔর বহনো মুন্নিকে মাকো ছোড়কর, যাদের মধ্যে এই ভাব আছে যে মুন্নির মাকে ছাড়া যাবে না, তাদের জন্য ঈশাবাস্যোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্র। আচার্য বলছেন বেদ মানুষের আয়ু একশো বছর নির্ধারিত করে দিয়েছে।

একশ বছরের আগে যদি কেউ মারা যায় তাহলে বলা হয় পূর্ব জন্মে তার কিছু পাপ ছিল বলে একশ বছরের আগেই সে মারা গেছে। আবার একশ বছরের পরেও যদি বেঁচে থাকে তাহলেও বলা হবে পাপকর্ম বেশি আছে বলে এত দিন বেঁচে আছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে এইটাই বলছেন – *অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত,* এই পৃথিবীতে কে আর বেশি দিন বাঁচতে চায়। আচার্য শঙ্কর তার উত্তরে বলছেন – অবিবেকী। যারা মুর্খ তারাই দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে চায়। একশ বছর মানুষের আয়ু এই মতটা বেদের। কেন বেদের মত? এই মতটা এসেছে বেদের মন্ত্র অংশে। কারণ মানুষের স্বভাব হচ্ছে সেই এই জগতকে ভোগ করতে চায়। কিভাবে সে ভোগ করবে? একশ বছর বেঁচে থেকে ভোগ করবে। তার সন্তানের বিয়ে দেখবে, নাতির মুখ দেখবে, নাতবউয়ের মুখ দেখবে, পোতার মুখ দেখবে, এই সব ভোগ করে সে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। ইহ জগতে ভোগের পর সেখানে গিয়েও সে ভোগ করতে থাকবে। ইহ জগতে কিভাবে ভোগ করবে? একশ বছর বেঁচে থেকে ভোগ করবে। যেমন যেমন তার ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় হতে থাকবে, ভোগের ক্ষমতা যখন কমে যাবে তখন সন্তান, নাতি-পোতার মাধ্যমে তার যে ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ হবে সেইটা দিয়ে তখন সে ভোগ করতে থাকবে।

তুমি যদি একশ বছর বেঁচে থাকতে চাও, একশ বছর বেঁচে থেকে যদি সুখ ভোগ করতে চাও, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তখন দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন – *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি,* তোমাকে তাহলে কর্ম করেই বেঁচে থাকার ইচ্ছে করতে হবে। কি কাজ করবে? শাস্ত্রে চার রকমের কাজের কথা বলে দিয়েছে – নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্য কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম। এর মধ্যে তুমি নিষিদ্ধ কর্মটি করবে না, কিন্তু নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম আর কাম্য কর্ম করবে। কারণ যেহেতু তুমি ভোগ করতে চাইছ তখন তোমাকে এই তিনটে কর্মই করতে হবে। এখানে এই আলোচনাতে বলবে না যে তুমি নৈমিত্তিক কর্ম আর কাম্য কর্ম করবে না। যেহেতু এটা বেদের মধ্যেই, তাই বেদ বলবে শাস্ত্রীয় কর্ম তাই এখানে কাম্যকর্মকে কিন্তু আলাদা করা হচ্ছে না। যার উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় মন্ত্র বলা হচ্ছে, সে তো বলছে – হ্যাঁ, আমি ভোগ করতে চাইছি। তাহলে সে কি করবে? তুমি যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে চাও অনায়াসেই করতে পারো, যদি রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাও তাও করতে পার।

কিন্তু এই কাজগুলো তুমি কিভাবে করবে? দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে বলছে – *এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে,* তুমি সব কিছুই কর কিন্তু কোন কর্মেই লিপ্ত হবে না। তোমার সন্তান কামনা আছে, সন্তান পাওয়ার আশায় তুমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে চাইছ, কর। কিন্তু সন্তানের প্রতি মায়া বাড়িও না। তোমার সুখ ভোগের ইচ্ছা হচ্ছে, সুখ ভোগ মেটানোর জন্য তোমাকে কর্ম করতে হচ্ছে, তার জন্য কর্ম কর কিন্তু সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি বাড়িও না।

ঈশাবাস্যোপনিষদের এই দুটো মন্ত্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং খুবই মূল্যবান। আঠারোটা মন্ত্র যদিও বা মুখস্ত না করা সম্ভব হয়, তাহলে অত্যন্ত এই দুটো মন্ত্র সবারই মুখস্ত করে রাখতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়, অবশ্যই মুখস্ত করে নেওয়া উচিৎ। বলা হয় সংসারে যত ধর্মশাস্ত্র আছে, সব শাস্ত্রকে যদি পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয় কিন্তু এই দুটি মন্ত্র যদি কোন ভাবে থেকে যায়, তাহলে কিন্তু এই দুটো মন্ত্র থেকেই আবার সব ধর্ম দাঁড়িয়ে যাবে। এই মন্ত্র দুটির ভাব কি? যদি তোমার মধ্যে সন্ন্যাস ভাব থাকে তাহলে ঈশ্বরই সব, এই ভাবটাকে সব সময় জাগ্রত রাখবে। আর তুমি যদি ভোগ করতে চাও তাহলে অনাসক্ত ভাবে কোন কিছুতে লিপ্ত না হয়ে কর্ম করে যাও। এই প্রথম দুটি মন্ত্র যদি থেকে যায় আর বেদ, পুরান, তন্ত্র, বাইবেল, কোরান সব ধর্মশাস্ত্রকে যদি অগ্নিতে পুড়িয়ে নাশ করে দেওয়া হয়, তাহলেও এই দুটি মন্ত্রের ভাব থেকে ধীরে ধীরে আবার সব ধর্ম দাঁড়িয়ে যাবে।

রিচাক ফাইনম্যান একজন নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন, নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। একদিকে তিনি খুব মেধাবী বিজ্ঞানী আবার খুব দক্ষতার সাথে অধ্যাপনাও করতেন। অনেক সময় দেখা যায় বিজ্ঞানী যাঁরা খুব মেধাবী হন শিক্ষক হিসাবে তেমন সুনাম অর্জন করতে পারেন না। ফাইনম্যান বলছেন, যদি মানবজাতির এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে মানবজাতির অবলুপ্তি হতে চলেছে, শেষ সময়ে মানবজাতি তার বিজ্ঞানের সব কিছুকে সংগ্রহ করে সংক্ষেপে পরবর্তি মানবজাতির জন্য যদি রেখে দিয়ে যেতে চায়, পরে সেখান থেকে পরবর্তি প্রজন্ম যে পুরো বিজ্ঞানকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে, তিনি তখন কেবল তিনটি কথাতে পুরো বিজ্ঞানকে রেখে দিলেন। প্রথম হচ্ছে – জগতে যা কিছু আছে সবই এ্যটম দিয়ে তৈরী, এ্যটম হচ্ছে basic unit। দ্বিতীয় হচ্ছে – এ্যটম যখন দূরে চলে যায় তখন এক অপরকে আকর্ষণ করে। তৃতীয় – খুব কাছে যখন চলে আস তখন এক অপরকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। শুধু এই তিনটে কথাকে যদি লিখে

দেওয়া হয় তাহলে পুরো বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে যাবে। বিজ্ঞানের যা কিছু আছে, এই তিনটে বাক্য থেকেই বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি পুরো ধর্ম ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম দুটো মন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথম মন্ত্রের ভাব – তুমি যদি ত্যাগী হতে চাও, সাধনা করে আত্মতত্ত্ব জানতে চাও তাহলে ঈশ্বরই সব এই ভাবনাকে অবলম্বন করে সব কিছুকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত কর। দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাব – তুমি যদি ভোগ করতে চাও, মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু কামাসক্ত কামিদের ভোগের কথা বলা হচ্ছে না, যারা ধার্মিক পুরুষ তাদের কথা বলা হচ্ছে, কারণ বেদের কথা অধার্মিকদের জন্য নয়, তখন তাদের জন্য বলা হচ্ছে, তুমি কাজ করে যাও কিন্তু কখন কোন কিছুতে লিপ্ত হতে যেও না। এই দুটো ভাব থেকেই ধীরে ধীরে সমস্ত ধর্ম আবার বেরিয়ে আসবে। ঈশাবাস্যোপিনষদের প্রথম দুটি মন্ত্রের এইটাই বৈশিষ্ট্য।

আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য একশ বছরের নির্ধারিত আয়ুতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত মানে কেউ যে ঠিক করে নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন তা নয়। বেদের সময়কার যাঁরা ঋষিরা ছিলেন তাঁরা মনে করতেন, মানুষ মোটামুটি একশ বছর বাঁচে। বলছেন, নর মাত্র অভিমানী, তার মানে মানুষ রূপে যার হুঁশ আছে। কুকুর বেড়ালের কখনই হুঁশ নেই যে সে কুকুর কিংবা বেড়াল, কিন্তু মানুষের হুঁশ আছে। ঠাকুর বলছেন, মানুষ কে, যার মানে আছে হুঁশ। হে নরে, যদি তোমার এই রকম ভোগ করা ইচ্ছে থাকে তাহলে কর্ম কর কিন্তু লিপ্ত হও না। আচার্য এখানে দ্বিতীয় মন্ত্রের এই অংশটাকে পুরোপুরি কর্মীদের, যারা সংসারী তাদের উদ্দেশ্য করেই বলছেন, সেইজন্য তাদেরকে বলছেন – *যেন প্রকারেণ অশুভং কর্ম ন লিপ্যতে*, অশুভ কর্মে তুমি কখনই লিপ্ত হতে যেও না। তার মানে, তুমি যদি ঠিক ঠিক সুস্থ ভাবে ভালো জীবন যাপন করতে চাও বা ধার্মিক জীবন যাপন করতে চাও, তাহলে শুধু মাত্র শাস্ত্রবিহিত কর্ম অগ্নিহোত্রাদির মত এই কর্মগুলোই করবে, অশুভ কর্ম কখনই করতে যেও না, তাহলে তোমার জীবনটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ, সম্মানিত জীবন হবে। বেদেও আমাদের কোন কিছুই করতে নিষেধ করা হয় না, বেদের কোথাও বলা নেই যে, তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে না, বিয়েথা করবে না, সন্তানের জন্ম দেবে না, আমোদ আহ্লাদ করবে না, কোন কিছুই বারণ করা হচ্ছে না। কিন্তু তুমি যেটাই ভোগ করবে সেটা যেন শাস্ত্রবিহিত হয়, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কোন কিছু করবে না।

গীতাতে যে বলা হচ্ছে কোন কর্মে লিপ্ত হবে না, সেটা কিন্তু ঈশাবাস্যোপনিষদের বক্তব্য থেকে আলাদা। গীতাতে কর্মযোগকে তুলে ধরা হচ্ছে, কিন্তু এখানে কর্মযোগকে তুলে ধরা হচ্ছে না, শুধু বলা হচ্ছে শাস্ত্র নিষিদ্ধ কোন কর্ম তুমি করবে না। সেই দিক থেকে ঈশাবাস্যোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্র গীতার কর্মযোগের কথা বলছে না। এখানে বলতে চাইছেন শাস্ত্র বিহিত কর্ম করতে করতে যখন ঠিক ঠিক মুক্তির দিকে এগোতে চাইবে, তখন তাকে বলা হবে এবার তুমি প্রথম মন্ত্রটাকে পালন কর – *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*, তোমার যে কর্ম আছে সেটাকে *ঈশা বাস্যমিদং* অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাবে আচ্ছাদিত করে দাও, এই কর্মটা ঈশ্বরের জন্যই করা হচ্ছে। এবার এখান থেকে তুমি চলে যাবে মুক্তিমার্গে। যারা ঘোর গৃহস্থ, তাদের জন্য এই দ্বিতীয় মন্ত্র। গীতার কর্মযোগ বলছে, শুভ কর্ম, শাস্ত্রবিহিত কর্মতেও যেন তোমার আসক্তি না থাকে, কিন্তু এই উপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্র বলা হচ্ছে শুভ কর্ম করে যাও কিন্তু অশুভ কর্মে তুমি লিপ্ত হবে না। আর প্রথম মন্ত্রে বলতে চাইছেন শুভ কর্মে লিপ্ত হবে না কারণ এই মন্ত্রটি সন্ন্যাসীদের জন্য। কর্মে লিপ্ত না হওয়াটা হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম, গৃহস্থরা কর্মে লিপ্ত না হয়ে থাকতে পারবে না, কখন সম্ভবই নয়। সেইজন্য গৃহস্থকে বলছে তুমি অশুভ কর্ম করো না, অশুভ কর্ম না করা মানে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করার কথা বলা হচ্ছে। শাস্ত্র যে রকমটি করতে বলেছে তার বাইরে তুমি কিছু করবে না। ভালো মন্দ খাওয়া-দাওয়া যখন করতে ইচ্ছে হবে, শাস্ত্রে যে রকমটি বলেছে, বিবাহের সময়, শ্রাদ্ধের সময়, অন্নপ্রাশনের সময় তুমি শাস্ত্রানুসারে ভালো ভোজের আয়োজন করে সবাইকে নিয়ে ভোগ কর। কিন্তু শুধু নিজের ভোগের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পশু হত্যা করে মাংস খাওয়াটাকে নিষেধ করা হচ্ছে। এখানে শুধু অশুভ কর্মটাকে বন্ধ করতে বলা হচ্ছে।

এখানে আচার্য একটা বিরাট লম্বা ভাষ্য দিয়ে যা বলার পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। অন্য দিকে অন্যান্য ভাষ্যকারর আপত্তি করে বলছেন – আপনি নিজের গায়ের জোরে দুটো মন্ত্রকে জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্মনিষ্ঠা বলে বিভাজন করে দিচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর আবার বিভিন্ন উপনিষদ থেকেই অনেক উদ্ধৃতি এনে দেখাচ্ছেন যে, সন্ন্যাসের বিধান শাস্ত্রেই দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য যখন কর্মের কথা বলা হচ্ছে, কর্ম করা হচ্ছে তখন এটা কখনই সন্ন্যাসীদের জন্য হতে পারেনা। তিনি বলছেন, সৃষ্টি যবে থেকে আছে, যবে থেকে পরম্পরাতে সৃষ্টির কথা বলা হয়ে আসছে, তবে থেকেই প্রথমে কর্মমার্গ এবং পরে সন্ন্যাসমার্গকে ঠিক করে দেওয়া আছে – *ক্রিয়াপথঃ সন্ন্যাসঃ*, ক্রিয়াপথ মানে কর্মের পথ আর দ্বিতীয় হচ্ছে সন্ন্যাস

পথ। এই ব্যাপারে আচার্য শঙ্কর একেবার দৃঢ়। গীতার ব্যাপারেও আচার্য এই একই কথা বলে বলছেন – *দ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্ম প্রবৃত্তিধর্ম লক্ষণঃ নিবৃত্তিধর্ম লক্ষণশ্চ,* গীতাও এই দুটো পথের কথা বলছে – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। কিন্তু পূর্বমীমাংসকরা আবার এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলবে, বেদের একটাই কথা কর্ম কর, সন্ন্যাসধর্মকে তারা কিছুতেই মানবে না। যার জন্য যখন আচার্য মণ্ডন মিশ্রের বাড়িতে গেলেন তখন মণ্ডন মিশ্র প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল, সে তখনই পারলে শঙ্করাচার্যকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেয়, আচার্যকে বাড়িতে ঢুকতেই দিল না। আচার্য যতই বলছেন আমি তোমার সাথে শাস্ত্রার্থ বিচার করতে এসেছি, মণ্ডন মিশ্র ততই বলছেন, এখন আমি শ্রাদ্ধাদি যুক্ত বেদের কর্ম করছি এখন ওসব হবে না, যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার বাড়িতে ঢুকতেই পারবে না। শঙ্করাচার্যকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, বাইরে বেরিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকলেন, শ্রাদ্ধাদি কর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পর শাস্ত্রার্থ করতে বসলেন। কর্মকাণ্ডী যারা, পূর্বমীমাংসকরা সন্ন্যাসীকে মানেই না, ওদের মতে সন্ন্যাস বলে কিছু হতেই পারেনা। পূর্বমীমাংসকদের সাথে ইসলাম ধর্মের খুব একটা পার্থক্য নেই, ইসলাম ধর্মেও বলছে, তুমি আল্লাকে ভালোবাস, ভালো ভালো কাজ কর আর মৃত্যুর পর স্বর্গে যাও। পূর্বমীমাংসকরা যে স্বর্গাদির কথা বলে বেদান্তও এটাকে যে একেবারে অস্বীকার করে তা নয়, এরাও মানে, কিন্তু বেদান্ত বলবে – তুমি যখন যজ্ঞাদি রূপ কাজ করছ, ভালো কাজ করছ, জপ-ধ্যানাদি করছ, প্রার্থনা করছ, তপস্যা করছ, এইভাবে দেবতার উপসনা করে যে স্বর্গে যাচ্ছ সেই স্বর্গটা চিরন্তন নয়, তোমার কর্মফলের ভোগ হয়ে গেলে আবার তোমাকে নীচে নামতে হবে। আচার্য শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাবেন, তোমরা যা বলছ শাস্ত্রে বলছে এটা হয় না। একমাত্র যখন আত্মতত্ত্বকে জানা হয়ে যায় তখন আর তাকে ফিরে আসতে হয় না। আত্মতত্ত্ব যখন জেনে গেল তখন সে কাজ করবে কিভাবে? আত্মতত্ত্ব যার উপলব্ধি হয়ে গেছে সে তখন ঈশ্বরের জন্যও কোন কাজ করবে না। যখন সে জেনে গেল আমিও যা তুমিও তাই, তখন সে কেন তার চাকরের মত কাজ করতে যাবে। যখন আত্মজ্ঞানী বুঝে গেল তিনিই সেই সর্বব্যাপী আত্মা, তখন তো তার ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ হয়ে গেছে, এরপর সে ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে যাবে কেন। সেইজন্য জ্ঞানমার্গ আর কর্মমার্গ এক সঙ্গে চলতে পারেনা।

কিন্তু এই ব্যাপারটাকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা, বাড়িতে নিজের স্ত্রী বা স্বামীর সাথেই একাত্ম বোধ হয় না, এদের ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ হবে কি করে। আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত কারুর না কারুর সাথে কথা কাটাকাটি লেগেই আছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিক্সাওয়ালার থেকে শুরু করে বাসে, ট্রেনে সহযাত্রীদের সাথে ঝগড়া মারামারি করে অফিসে গিয়ে বস্‌এর সাথে সহকর্মীদের সাথে দিন রাত লড়াই চলছে, বাড়িতে ফিরে আবার বউয়ের সাথে ঝগড়া, কারুর না কারুর সাথে লড়াই চলতেই থাকে, এদের একাত্ম বোধ কি করে আসবে! এইজন্যই বলা হয় কর্ম কর, কর্মই তোমাকে পথে নিয়ে এসে সোজা করে দেবে, জ্ঞানমার্গ এদের জন্য হয়। ঠিক এই কারণেই ঋষিরা গৃহস্থদের সামনে উপনিষদের কথা আলোচনা করতে চাইতেন না। কেননা, এইসব কথা শুনে বদহজম হয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলে নিজেকেও ঠকাবে আবার অপরের মাথাটাকেও বিগড়ে দেবে। তবে এই ধরণের কথা শুনে রাখা ভালো। অনেকে শুনেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর প্রয়োগ করে প্রথমেই বলতে শুরু করবে আমি সব বুঝে গেছি, ঈশ্বর এক, সব ধর্ম এক জায়াগাতেই যায়। কিন্তু একটা ধর্ম দিয়েই তুমি এখনও ঈশ্বরকে জানতে পারনি আবার বলছ ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব এক। যে কোন একটাকে আগে দর্শন কর, তারপর তুমি উপদেশ দিতে এসো। আবার বেশির ভাগ ভক্তই কিছু হলেই কথায় কথায় বলবে সবই তাঁর ইচ্ছা। যে বলছে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, সেতো আত্মজ্ঞ, সেতো ঈশ্বর তত্ত্ব জেনে গেছে। কোন কাজ কর্ম করা নেই, কোন সাধন-ভজন নেই, তপস্যা নেই, মনের এতটুকু পবিত্রতা নেই কিন্তু বড় বড় তত্ত্ব কথার ফুলঝুড়ি ছোটাবে।

যারা একেবারে আত্মকাম পুরুষ, জগৎ থেকে তিনি কিছুই চাইছেন না। সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল থেকে এই দুটি পথ, জ্ঞানমার্গ আর কর্মমার্গ পরম্পরা গত। প্রথমে কর্মমার্গ, কর্মমার্গ করে নেওয়ার পর সন্ন্যাসমার্গ। আচার্য বলছেন বেদ এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত।

এরপরে তিন নম্বর মন্ত্র থেকে শুরু করে আট নম্বর মন্ত্র পর্যন্ত, এই ছটি মন্ত্র সন্ন্যাসীদের জন্য। এখানে সন্ন্যাসী বলতে বোঝাচ্ছে যারা সন্ন্যামার্গে সাধনা করছে, কিন্তু যাঁরা একেবারে প্রকৃত সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজীর মত, তাঁদের জন্য এই সব উপদেশ নয়। এই উপদেশে যারা সন্ন্যাসের পথকে অবলম্বন করেছে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে – তুমি সন্ন্যাসমার্গে সাধন করতে যাচ্ছ তাই তোমাকে এই ভাবকে অবলম্বন করে চলতে হবে। কি সেই ভাব? প্রথমে অজ্ঞানের

নিন্দা করছেন, অজ্ঞানের নিন্দা করা মানে বিপরীত দিকে জ্ঞানীর প্রশংসা করা, এইটাই এই উপনিষদের অর্থবাদ। অজ্ঞানীদের নিন্দা করে তৃতীয় মন্ত্রে বলছেন –

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।৩

যারা আত্মহন্তা, তারা *প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি*, মৃত্যুর পর *অসুর্যা নাম তে লোকা*, অসুর্য নামে লোকে গমন করে। এই লোকের কি বৈশিষ্ট্য? *অন্ধেন তমসাবৃতাঃ*, অসুর্য লোক একেবারে অন্ধকার। কি রকম অন্ধকার? অন্ধ তমসা, শুধু অন্ধকারই নয়, অন্ধকারের উপর আবার তমসাকে যোগ করা হচ্ছে, blinding darkness এই ধরণের তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে তাদের পতন হয়। দয়ানন্দ সরস্বতি বেদের বিরাট পণ্ডিত, তিনি বেদের অর্থ সব হিন্দীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোর কর্মকাণ্ডী, এমন ঘোর কর্মকাণ্ডী যে তিনি উপনিষদাদিকে একেবারেই মানতেন না। তিনি এই মন্ত্রের অনুবাদ করেছেন, যারা আত্মহত্যা করে তারা নরকে গিয়ে পড়ে। কি রকম সেই নরক? অসুর্যা নামক নরকে। কিন্তু আচার্য দেখছেন আত্মহত্যার কোন কিছুর বিষয় এখানে নেই হঠাৎ আত্মহত্যার কথা কেন বলা হবে? আচার্য আত্মহত্যার ব্যাপারটাকে একেবারেই নিয়ে আসতে দেবেন না। পুরো ব্যাপারটাকে যুক্তি বিচারের দ্বারা বিশ্লেষণ করে মন্ত্রের মূল ভাবকে সামনে নিয়ে আসবেন। আচার্য বলবেন, যারা অজ্ঞানী তারাই এই তমসাকীর্ণ অন্ধকার অসুর্য লোকে গিয়ে পড়ে। আত্মহন্তা কেন বলা হবে, এটাকে তিনি পরের দিকে গিয়ে পরিষ্কার করবেন। যদি আমি এই জন্মে জ্ঞান প্রাপ্ত না করতে পারি তাহলে আমি অজ্ঞানী? আমি তা হলে কি হলাম? আত্মহন্তা। আমার মত লোকেরাই অন্ধকূপে গিয়ে পড়ে। এবারে আচার্য পরিষ্কার করে বলছেন – *অসুর্যা* মানে, পরমাত্ম ভাবের যেখানে অভাব, যেখানেই পরমাত্ম ভাবের অভাব, সে যে জায়গাই হোক না কেন সেই জায়গাটাই অসুর্যা। এখানে অসুর্যাকে অন্ধকারের অর্থে বলা হচ্ছে। সূর্য হচ্ছে আলোর প্রকাশ, সূর্য মানেই আলো। অসুর্যা মানে যেখানে আলো নেই। কোন্ আলো নেই? বলছেন, পরমার্থ ভাব। যেখানেই পরমার্থ ভাব নেই সেখানেই অসুর্যা। সেই অর্থে *দেবাদয়োঽপি অসুরা*, পরমার্থের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তাহলে দেবতারাও অসুর। এখানে অসুর্যা লোকের সঠিক অর্থ হচ্ছে আসুরি লোক। মৃত্যুর পর কোথায় যায় এরা? আসুরি লোকে। কারা যায়? যারা পরমার্থ জ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত। সেই অর্থে দেবলোকও আসুরি লোক। কেন আসুরি লোক? কারণ সেখানেও তো পরমার্থ জ্ঞান হচ্ছে না। পরমার্থ জ্ঞান যদি তোমার না হয়ে থাকে তাহলে তুমি যেখানেই থাকো না কেন, পৃথিবীতেই থাক কিংবা নরকেই থাক, স্বর্গে আছ কি পাতালে আছে, সবটাই এক, কোন লোকেরই কোন মূল্য নেই। পরমার্থ জ্ঞান শূন্য অবস্থায় মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে গেলে, কি পাতালে গেলে, কোনটারই কোন মূল্য নেই। কোন যোনিতে জন্ম নিলে তাতেও কিছুই যায় আসে না। কারণ প্রত্যেকটি যোনি আর প্রত্যেকটি লোক এই অর্থে *অসুর্যা নাম তে লোকা*। মূল বক্তব্য হচ্ছে, তোমার যদি আত্মজ্ঞান না হয়, পরমার্থ ভাবকে যদি না অবলম্বন করতে পার, অদ্বয় ভাব মানে অভেদ দৃষ্টি যদি না আনতে পার তাহলে জন্মাতে থাকবে আবার মরতে থাকবে, আবার জন্ম নেবে আবার মরবে এইভাবেই চলতে থাকবে। আর যেখানেই তুমি জন্ম নাও না কেন সেটা অসুর লোক।

আচার্য এর পর বলছেন, *তে লোকা*, লোক কেন? লোকা মানে *কর্মফলানি*, যেখানে কর্মফলের দর্শন করা হয় আর কর্মফলকে ভোগ করা হয়। যখনই বলা হচ্ছে দেবলোক, মানে সেখানে কিছু ধরণের কর্মফলের ভোগ করা হয়, ব্রহ্মলোক মানেও তাই, সেখানে অন্য ধরণের কর্মফলের ভোগ হয়, তেমনি রামকৃষ্ণলোক, সেখানেও কিছু ধরণের কর্মফলের ভোগ কাটাতে হবে। যখনই লোক শব্দ আসবে, *লোক্যন্তে* মানে দেখা যায়, দৃশ্যন্তে মানে দেখা যায়, দেখা যায় মানে ভোগ করা যায়। যে জায়গাতে কোন ধরণের ভোগের সম্ভবনা থাকবে সেটাই হচ্ছে আসুরি লোক, কারণ ওখানে পরমার্থ ভাব মানে অদ্বয় ভাব অর্থাৎ অভেদ দৃষ্টি আসে না। অভেদ দৃষ্টি যেখানে আনা যাবে না সেটাই একেবারে *অন্ধেন তমসাবৃতাঃ*। *অদর্শনাত্মক*, মানে দেখা যায় না। কি দেখা যায় না? অভেদ দৃষ্টি। সাধারণ লোক তো এই উচ্চ ভাব আর তত্ত্ব কথা বুঝতে পারবে না, তখন তাদের জন্য একটা কাহিনী বানিয়ে বলা হবে – অমুককে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলো না বলে তাকে একটা অন্ধকূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। সেই অন্ধকূপে তাকে হাজার হাজার বছর পড়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু উপনিষদ এই সব কাহিনীর ধারে কাছেও যাবে না, উপনিষদ সরাসরি বলে দিচ্ছে – অভেদ দৃষ্টি যদি তোমার না হয়, অদ্বয় জ্ঞান যদি তোমার না হয় তাহলে তুমি কিন্তু জন্মাতে থাকবে আর মরতে থাকবে।

আর যেখানেই তুমি জন্ম নাও না কেন, দেবলোকেই জন্মাও আর ব্রহ্মলোকেই জন্মাও সবটাই হল অসুরলোক। কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো অসুরলোক? পরামার্থ দৃষ্টিকোণ থেকে। তোমার জন্মটি কি রকম হবে? যেমনটি তোমার জ্ঞান হবে আর তুমি যেমনটি কর্ম করবে তার উপর তোমার জন্ম নির্ভর করবে।

আচার্য এইবার *আত্মহনঃ* এই শব্দের ব্যখ্যা করে বলছেন, যারাই আত্মার নাশ করেন তারাই আত্মঘাতী, যারা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ছে, ট্রেনের তলায় গলা দিয়ে দিচ্ছে, এরাই শুধু আত্মঘাতী নয়, যারাই আত্মার নাশ করে তারাই আত্মঘাতী। কি রকম ভাবে তারা আত্মার নাশ করে? আচার্য বলছেন, যেটা নিত্য-শুদ্ধ আত্মা, আমাদের শাস্ত্র বলছেন আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা নিত্য, আত্মা শুদ্ধ, আত্মা এই এই, কিন্তু সেই আত্মাকে আমরা তিরস্কার করছি। তিরস্কার মানে আত্মার নাশ করে দেওয়া। মহাভারতে এক জায়গায় যুধিষ্ঠিরের উপর অর্জুন রেগে গিয়ে বলছেন – আপনাকে আমি হত্যা করব, আপনি আমার গাণ্ডীবের নিন্দা করেছেন। তখন এই নিয়ে বিরাট সমস্যা হয়ে গেছে, অর্জুন যখন বলে দিয়েছে তখন যুধিষ্ঠিরের প্রাণ সংশয় হয়ে গেছে। এদিকে যুধিষ্ঠিরকেও বাঁচাতে হবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে এসে অর্জুনকে বলছেন, তুমি যদি যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে দাও তাহলে এটা তার মৃত্যুর সমান হয়ে যাবে। তখন অর্জুন নিজের দাদাকে শুরু করলেন গালাগাল দিয়ে তিরস্কার করতে – বেশ আছ তাই না, দ্রৌপদীর বিছানায় বসে বড় বড় কথা বলছ, ঐসব বুক্‌নি না মেরে আগে যুদ্ধে নাম, যুদ্ধে নেমে দেখাও। এইভাবে নিজের দাদাকে প্রচণ্ড গালাগাল দিয়ে তিরস্কার করাতে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু হয়ে গেল, অর্জুনের কথাও রাখা হল। তিরস্কার করার পর অর্জুন আবার পরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। যুধিষ্ঠির ক্ষমা ঠিকই করে দিলেন, কিন্তু ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে ঐ রকম গালাগাল শোনার পর বলছেন – এর থেকে আমার মরে যাওয়াই ভালো ছিল, অর্জুন আমাকে যা অপমান করেছে আমি আর থাকছি না, আমি চললাম। শ্রীকৃষ্ণ আবার যুধিষ্ঠিরকে কোন ভাবে ঠাণ্ডা করে আটকালেন। মূল কথা হচ্ছে কাউকে তিরস্কার করা মানে তার গলা কেটে দেওয়া। তুমি যে আত্মার তিরস্কার করছ, তার মানে তুমি আত্মঘাতী *চাত্মহনো জনাঃ*। তুমি যখন আত্মজ্ঞান পাচ্ছনা, তুমি কি বুঝতে পারছ আত্মা সর্বব্যাপী, তুমি কি জান আত্মা নিত্য-শুদ্ধ, তুমি কি জান আত্মা অবিনশ্বর। যখন তুমি জানতে পারছ না আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা নিত্য, আত্মা শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধম্ তখন আত্মাকে তিরস্কার করাই হল। আত্মাকে তুমি এখন কি ভাবে জানছ? আত্মা আমার দেহের মধ্যে আছেন, তার মানে আত্মাকে তুমি ছোট করে দিয়ে তাঁকে তিরস্কার করে দিলে। মহৎকে ছোট করে দেওয়া মানেই তাকে তিরস্কার করা হয়ে গেল, তার মৃত্যু হয়ে গেল। এই ধরণের লোকেরা যে পাপ করেছে, কি পাপ? আত্মার তিরস্কার করার পাপ। আত্মার তিরস্কার করে যে পাপ, সেই পাপে তারা *প্রেত্য,* মৃত্যুর পর তারা কোথায় যায়? *অসুর্যা নাম তে লোকা।* আসল কথা হচ্ছে, যারাই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেনা তাদেরকে বারবার জন্মাতে হবে ও মরতে হবে। এই মন্ত্রের অর্থ ও ভাব এইটাই। এখন এই উপনিষদের ঋষি, যিনি এই মন্ত্রটাকে আবিষ্কার করেছিলেন তিনি অন্য অর্থেও বলে থাকতে পারেন কিনা সেটা আমাদের জানা নেই। কিন্তু উপনিষদের অর্থ নিরুপণ করার যে নিয়ম – উপক্রম-উপসংহার অভ্যাস অপূর্বতা ইত্যাদি, এই নিয়মানুসারে এই মন্ত্রের এই অর্থ হওয়া ছাড়া অন্য কোন অর্থ হতে পারেনা, আচার্য ঠিক সেইভাবেই অর্থটাকে দাঁড় করিয়েছেন। আচার্য ব্যাকারণের নিয়ম, দর্শনের নিয়ম, পূর্বমীমাংসকদের নিয়ম, সব নিয়মকে অনুসরণ করে এই অর্থ দিচ্ছেন। কি অর্থ? তুমি যদি আত্মজ্ঞান না লাভ করতে পার তাহলে তুমি *আত্মহনঃ,* আর আত্মজ্ঞান বাইরে থেকে আসবে না, এখানে তিনি চন্দনের উপমা নিয়ে এসেছিলেন, চন্দনের স্বাভাবিক সুগন্ধ জলের সংসর্গে থাকাতে দুর্গন্ধ দিয়ে ঢাকা পড়ে আছে। চন্দনকে ঘষে দিলে তার ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া দুর্গন্ধ চলে যাবে। এই আত্মজ্ঞান থেকে যারা সরে আছে তারা আত্মঘাতী, এই আত্মঘাতের ফলে তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রের মধ্যে ঘুরতে থাকে।

এরপরে বলবেন, যারা এই রকম আত্মঘাতী নয়, তাঁরাই আত্মতত্ত্বকে জেনে জান। আত্মতত্ত্ব কি রকম? সেই আত্মতত্ত্বের আলোচনা পরের মন্ত্র থেকে শুরু করছেন।

৫/১২/২০১০

যারা আধ্যাত্মিক জীবন বা ধর্মীয় জীবন যাপন করতে চাইছেন তাঁদের আচার আচরণ কি রকম হবে, সংসারে সমাজে সে কি ধরণের কাজকর্ম করতে করতে আরও উচ্চস্তরে কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে এই নিয়েই বেদের পুরো বক্তব্য। বেদের এই সামগ্রিক বক্তব্যকে দুটো পথে এনে দাঁড় করান হয়েছে, একটা হল প্রবৃত্তিমার্গ আর দ্বিতীয়টি হল নিবৃত্তিমার্গ, বা কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ। ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী, যারা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী তাদের

জন্য বলা হচ্ছে *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*। তার মানে তুমি যদি জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী হতে চাও, জগতের কোন কিছুর প্রতি তোমার যদি আকর্ষণ না থাকে, তাহলে তোমাকে একটা জিনিষ পালন করতে হবে। কি পালন করতে হবে? তোমার ভেতরে যিনি প্রত্যগাত্মা আছেন সেই আত্মাই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যা কিছু আছে, স্থাবর জঙ্গম, সব কিছুতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, এই ভাবনটা তুমি আরোপ কর। এই জগতে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, জগতে যা কিছু দেখছ সব তাঁরই একেকটি রূপ। এটাকে আরোপ করলে তুমি সেই ভাবটা পেয়ে যাবে। এই ভাবটাকে আরোপ যখন করবে তখন নিজের বা অপরের কারুর কোন কিছুতে এষণা করবে না এবং সাথে সাথে সব সময় ত্যাগের অনুশীলন করে যাবে। এবার যদি কেউ বলে আমার দ্বারা সব কিছু ত্যাগ করা সম্ভব নয়, আমার মনে এখন ভোগের ইচ্ছে আছে, তখন তার জন্য বলছেন, তুমি যদি অনেক দিন বেঁচে থেকে ভোগ করতে চাও তাহলে তোমাকে শাস্ত্রে যে রকমটি কাজ করার কথা বলা হয়েছে, সেই কাজ করতে থাক আর ভোগ করে যাও। শাস্ত্রীয় কর্ম করলেই তুমি দৃষ্ট ফল, মানে এই জীবনে অর্থ, সম্পদ, সন্তানাদি, নাম-যশ পাবে ও অদৃষ্ট ফল মানে মৃত্যুর পর তুমি ভালো স্বর্গাদিতে গমন করবে। কিন্তু তুমি যে কাজগুলো করবে সেই কাজের মধ্যে কখন লিপ্ত হবে না। এখানে আচার্য লিপ্ত কথাতে জোর দিয়ে বলছেন – তুমি কোন অশুভ কর্মে লিপ্ত হবে না, কোন শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম করবে না।

এইখানেই গীতার কর্মযোগ আর ঈশাবাস্যোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। অনেকে ব্যাখ্যা করার সময় ভুল করে দ্বিতীয় মন্ত্রকে গীতার কর্মযোগের সাথে এক করে ফেলেন, কিন্তু এটি কখনই গীতার কর্মযোগ নয়। কারণ *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি* শুনলেই মনে হবে কর্মযোগের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় মন্ত্রটি কর্মযোগের ঠিক নীচের ধাপ, যেখানে বলা হয়ে থাকে যে তুমি নিষিদ্ধ কর্ম করবে না, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্য কর্ম করবে। এখানে কাম্য কর্ম করার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কর্মযোগ কাম্য কর্মকে কখনই অনুমতি দেওয়া হয় না। তাই গীতাতে কর্মযোগ, যেটিকে একটা সাধনার পথ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার এখানে কোন স্থান নেই। ঈশাবাস্যোপনিষদের দুটো মন্ত্র পরিষ্কার দুজনের জন্য দুটো পথ আলাদা করে বলে দেওয়া হচ্ছে, প্রথম মন্ত্র সন্ন্যাসের পথ আর দ্বিতীয় মন্ত্র গৃহস্থদের জন্য। এর সাথে গৃহস্থ যে ভোগ করতে চাইছে তার কথাও দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু যে গৃহস্থ চাইছে আমি সংসারে থেকেই মুক্তি পেতে চাই, সেই ব্যাপারে এখানে কোন আলোচনা করা হচ্ছে না। গীতাতে তিনজনের জন্য তিনটে আলাদা আলোচনা করা হয়েছে, যারা গৃহস্থ তাদের জন্য একটা আলোচনা, যারা সন্ন্যাসী তাদের কথা আর যে গৃহস্থ চাইছে সংসারে থেকে যেন সন্ন্যাসী হয়ে মুক্তি পেতে, তার আলোচনা আছে। কিন্তু ঈশাবাস্যোপনিষদ শুধু সন্ন্যাসী আর গৃহস্থকে এই দুটো মন্ত্রের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন, এখানে তৃতীয় কোন পথ নেই। শুধু ঈশাবাস্যোপনিষদেই না, উপনিষদের কোথাও কর্মযোগের কোন স্থানই নেই। উপনিষদ পরিষ্কার দাগ টেনে দিয়েছে, তুমি ভোগ করতে চাও ঐ দাগের বাইরে, আর তুমি ত্যাগ করতে চাও তাহলে তুমি দাগের এই দিকে। তৃতীয় মন্ত্রে বলা হচ্ছে – যদি তুমি প্রথম মন্ত্রের পথকে অবলম্বন না করতে পার তাহলে তুমি হয়ে গেলে আত্মহন্তা, তুমি বার বার জন্মাবে আর মরবে, জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি হবে না। মুক্তি না হওয়াই বার বার জন্ম নেওয়া আর মরে যাওয়া। কেন জন্মাবে আর মরবে? কারণ তুমি আত্মাকে তিরস্কার করেছ। যখনই তুমি আত্মজ্ঞান থেকে দূরে সরে থাকবে তখনই সেটা হবে আত্মার তিরস্কার। আত্মার তিরস্কার হলে কি হবে? পাপ করলে ফল পেতে হয়। কি পাপ তুমি করেছ? আত্মার তিরস্কার করেছ। পাপের ফল – জন্মাতে আর মরতেই থাকবে। কোথায় জন্মাবে? *অসুর্যা নাম তে লোকা,* এই লোকের নাম অসুরদের লোক। এই লোক কি রকম? *অন্ধেন তমসাবৃতাঃ,* শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার, এই অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে তোমাকে জন্মাতে হবে।

আচার্যের ভাষ্য না পড়ে শুধু শাব্দিক অর্থ করলে পুরো অর্থটাই পাল্টে গিয়ে অন্য একটা তত্ত্ব সামনে চলে আসবে। শাব্দিক অর্থ করলে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ গিয়ে দাঁড়াবে, যে আত্মহত্যা করে সে যেখানে মহা অন্ধকার সেই রকম কোন অন্ধকূপ নরকে গিয়ে পড়ে। এখানে কিন্তু আদপেই এই অর্থে বলা হচ্ছে না, এখানে বলা হচ্ছে যেখানে আত্মজ্ঞান পাওয়া যায় না সেটাই অসুরদের লোক, এই অর্থে দেবতাদের লোক এমনকি ব্রহ্মলোকও অসুরদের লোক। যে কোন যোনিতেই তোমার জন্ম হোক না কেন সেটাই অসুরদের লোক। অসুরদের লোক সব সময় অন্ধকার। কিসের অন্ধকার? অজ্ঞানতার অন্ধকার, আত্মজ্ঞানের অভাব, আত্মজ্ঞান এখানে পাওয়া যায় ন। এই ব্যাপারগুলো আমরা এর আগে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। আত্মজ্ঞানী মুক্ত হয়ে যান। মুক্ত হয়ে যাওয়া মানে আত্মজ্ঞানী আর আত্মঘাতী হন না, তাই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে জন্ম নিতে হচ্ছে না। আত্মজ্ঞানী কাকে বলা হচ্ছে? বলছেন যিনি আত্মতত্ত্ব জেনে যান। তাহলে আত্মতত্ত্বটা কি রকম আমাকে আগে জানতে হবে। চার থেকে সাত নম্বর মন্ত্র পর্যন্ত আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অষ্টম মন্ত্রে গিয়ে

আত্মতত্ত্বের পুরো জিনিষটাকে কয়েকটা শব্দের মধ্যে দিয়ে আরও পরিষ্কার করে বলে দিলেন। ঈশাবাস্যোপনিষদের এই ছয়টি মন্ত্র, তিন থেকে শুরু করে আট পর্যন্ত, পুরোপুরি যাঁরা জ্ঞাননিষ্ঠ তাঁদের জন্য। এই ছয়টি মন্ত্রে প্রথমে ভেদ দৃষ্টির নিন্দা করা হচ্ছে তারপর আত্মতত্ত্বের বর্ণনা করে আত্মতত্ত্বের ফলের বর্ণনা করা হচ্ছে। আর শেষে গিয়ে বলে দিচ্ছেন আত্মা কি রকম। চতুর্থ মন্ত্রে প্রথমে আত্মতত্ত্বের বর্ণনা শুরু করে বলছেন –

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।।৪

বেদের অর্থ নিরুপণের ক্ষেত্রে পূর্বমীমাংসকরা কতকগুলি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন, যা দিয়ে বেদের অর্থ নির্ধারণ করতে হবে, ষড়লিঙ্গে এই নিয়ে এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই নিয়মগুলির মধ্যে একটা নিয়ম হল উপপত্তি। যে বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেখানে একটা উপপত্তি থাকবে। উপপত্তির অর্থ হচ্ছে, আমি একটা সিদ্ধান্ত বলে দিলাম, এখন এই সিদ্ধান্তের একটা পরিণতি থাকতে হবে, যাই পরিণতি হোক না কেন সেটা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, তার মানে যে সিদ্ধান্তই আমি নিই না কেন তার একটা যুক্তিসঙ্গত পরিণাম থাকতে হবে। চতুর্থ মন্ত্রটি হচ্ছে উপপত্তি। আত্মতত্ত্ব কি বলতে গিয়ে বলা হল আত্মা হচ্ছেন সর্বব্যাপী, অনন্ত, নিত্য ইত্যাদি। যদি আত্মতত্ত্ব নিত্য হয়, অনন্ত হয়, সর্বব্যাপী হয়, তাহলে তার যুক্তিসঙ্গত উপসংহার কি হবে? চতুর্থ মন্ত্রে আত্মতত্ত্বের যুক্তি সঙ্গত উপসংহারের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমরা ঠাকুরকে এক ভাবে দেখছি, তিনি অবতার, তাতে আমার আপনার কি হল? বিল গেটস্ বিরাট ধনী লোক, তাতে আমার কি হল? কিন্তু কেউ যদি বলে আমার বাবা বিরাট বড়লোক, এই বক্তব্যের যুক্তি সঙ্গত কি উপসংহার হবে? আমি বাসে চাপিনা, ট্যাক্সিতে চাপি। ছেলে যদি বলে আমি ট্যাক্সিতে চলাফেরা করি, এখান থেকে আমি কি সিদ্ধান্তে আসব? ছেলের বাবা বিরাট বড়লোক। বেদের মন্ত্রের যখন বিচার হয় তখন প্রথমে এটাকেই বিচার করা হয়। মন্ত্রে যে নিষ্কর্ষ দেওয়া হয়েছে তার পরিণাম কি? সেই পরিণামটাও যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমি বলছি শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। খুব ভালো কথা, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে মানছ, কিন্তু এর যুক্তিসঙ্গত ফলাফলটা কি? ফলাফল হল জিরো। তুমি তো যে কলুর বলদ ছিলে সেই কলুর বলদই আছ। কিন্তু আমি যদি বলি – আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত কিনা, তাই আমি ও আমার স্ত্রী ভাই-বোনের মত থাকি। আমি চুরি-চামারি করিনা, অফিসে ঘুষ নিইনা, কাজ নিষ্ঠার সাথে করি। কেন করি? আমি স্বামীজীর ভক্ত। আমি পড়েছি স্বামীজী কর্মযোগে এই রকম বলেছেন। এটা হল একটা সিদ্ধান্তমূলক বিবৃতি। এই বিবৃতির পরিণামটা কি? আমি সৎ, কাজ নিষ্ঠার সাথে করি, ঘুষ নিইনা, কাউকে কষ্ট দিইনা। এইখানে এটা একটা পরিণাম হয়ে গেল। তখন এটাই হয়ে গেল উপপত্তি। উপপত্তি কিন্তু ফল নয়, যুক্তি সম্মত সিদ্ধান্ত। যে স্বামীজীর ভক্ত হবে তাকে ধরেই নেওয়া হবে সে কাজে কর্মে খুব দক্ষ হবে, চুরি করবে না, সবার প্রতি তার ভালোবাসা থাকবে। মানুষ সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে আগে থাকতেই অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, সাধুদের ব্যবহার ভালো হবে, ত্যাগ-তপস্যা থাকবে, এই ধরণের সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে এসে যায়। এগুলো হচ্ছে সংসারে থাকতে থাকতে অনেক কিছু শুনে শুনে মানুষের মনে এই ধারণাগুলো চলে আসে। কিন্তু এখানে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে নিয়ে এসে তার উপপত্তি করা হচ্ছে। কি সেই তত্ত্ব? আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা অনন্ত, নিত্য। এবার মন্ত্রে এইভাবে আত্মতত্ত্বের যুক্তি সম্মত পরিণামের কথা বলা হচ্ছে তাই এই মন্ত্র এই উপনিষদের উপপত্তি। আত্মতত্ত্বের কি যুক্তি সম্মত ফলাফল?

আত্মতত্ত্বকে বোঝাবার জন্য এখানে পরস্পর বিরোধী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। *অনেজদেকং – অনেজৎ একং,* আত্মতত্ত্ব সব সময় এক রূপ, কখনই পাল্টায় না, আত্মা চলেনা, অচল, অনড়। Lawrence Transformation Theory, আইনস্টাইন যেটার উপর ভিত্তি করে তাঁর Theory of Relativity আবিষ্কার করেছেন, সেখানে বলছেন, এক মিটারের একটা লোহার রডকে যদি একটা গতি দিয়ে দেওয়া হয়, আর তার গতি যত আলোর গতি বেগের কাছাকাছি যেতে থাকবে ততই গতিপথের দিকে এর দৈর্ঘ্যটা সঙ্কুচিত হতে থাকবে। আর যদি সে পুরোপুরি আলোর গতিকে ধরে নেয় তাহলে তার দৈর্ঘ্য শূন্য হয়ে যাবে। যেমন যেমন তার গতিবেগ বাড়ছে তেমন তেমন তার দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে। গতিমুখের

দিক থেকে তার দৈর্ঘ্যটা কমবে, কিন্তু উল্টো দিক থেকে যদি মাপা হয় তাহলে তার দৈর্ঘ্যের কোন হেরফের হবে না তখন এক মিটারই থাকবে, কিন্তু গতিমুখের দিক থেকে মাপলে দৈর্ঘ্য শূন্য দেখাবে। এইটাই একটা পরস্পর বিরোধী পরিণাম। যখন এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে তখন তার এক রকম দৈর্ঘ্য, যখন চলছে তখন গতির মুখে তার দৈর্ঘ্য অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে আবার যখন উলম্ব অবস্থায় মাপা হবে তখন তার মাপ অন্য রকম হয়ে যাবে। আত্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম খাটবে না, আত্মতত্ত্বের বেলায় কি হচ্ছে? *অনেজৎ*, চলে না, একেবারে স্থির। *একং*, সব সময় এক রূপ। কখনই অন্য রূপ পরিগ্রহ করবে না। *একং* বলতে এখনে এক বলা হচ্ছে না, *একং* বলতে এক রূপের কথাকে বলা হচ্ছে, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, সেইজন্যই *একং*। *মনসো জবীয়ো*, মন থেকেও সে দ্রুতগামী। প্রথমে বললেন *অনেজৎ*, *এজৎ* মানে চলা, *অনেজৎ* মানে চলে না, আত্মা স্থির, আত্মা চলে না। কিন্তু *মনসো জবীয়ো*, যাঁর এক রূপ সব সময়, যে স্থির, কোন রকম ভাবেই চলে না, তিনিই আবার মন থেকেও দ্রুতগামী। এইটাই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বোকা মুর্খদের জন্য নয়। যাদের বুদ্ধি প্রচণ্ড সূক্ষ্ম, ক্ষুরধার বুদ্ধি যাদের, তাদের জন্য আধ্যাত্মিকতা। খাঁটি ঘি না খেলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় না, মাংস বেশি খেলে বুদ্ধি স্থূল হয়। প্রচণ্ড সূক্ষ্ম বুদ্ধি যদি না থাকে, একটা তত্ত্বকে চটপট না ধরতে পারলে কিছুতেই আধ্যাত্মিক সম্পন্ন হতে পারবে না।

একটা জিনিষকে না জানলে সেই জিনিষের প্রতি ভালোবাসা হয় না, যদি স্থূল বুদ্ধি হয় তাহলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে জানতেই পারবে না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে যখন বুঝতেই পারছি না, তখন সেই তত্ত্বের প্রতি ভালোবাসা হবে কি করে! সেইজন্য এইসব তত্ত্বকে ধারণা করার জন্য প্রচণ্ড সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। সাধুসঙ্গ, নির্জন বাস করলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয়। বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করলে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় না। যতটুকু কাজ সামনে আসবে ততটুকু কাজ করে দিতে হবে, কিন্তু পাঁচ রকম লোকের সাথে মেলামেশা করলে পাঁচ রকম ভাব আসে, এতে মন নানান রকমের চিন্তা ভাবনাতে চঞ্চল হয়ে যায়। মন যখন স্থিতি লাভের পথে এগোয়, মন যখন শান্ত হতে থাকে আর যখন সম্ভাবনা মনের মধ্যে জাগ্রত হয় তখন মনের তীক্ষ্নতা বাড়ে। কুড়োলের ধারের মত বুদ্ধিটা আস্তে আস্তে ব্লেডের মত ধারালো হতে থাকে। এখন যদি বলা হয় একটা খুব পাতলা সুতোকে লম্বালম্বি পাঁচটা অংশে যদি ভাগ করতে পার তাহলে সেখান থেকে তুমি একটা অত্যন্ত মূল্যবান জিনিষ পেয়ে যাবে, তখন কোদাল দিয়ে কি এই সুতোকে ভাগ করা যাবে? ঠিক সেই রকম কোন তত্ত্বকে যদি সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করে নিতে পারা যায় তখন সেই তত্ত্ব থেকেই আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি হচ্ছে কুড়ুলে মার্কা বুদ্ধি, ব্লেডের মত তীক্ষ্ণ ধারালো বুদ্ধি না হলে এই তত্ত্বের ধারণাই হবে না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ধারণা করার জন্য চাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি। দীর্ঘ দিন শাস্ত্র চর্চা করে গেলে তবেই একমাত্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি হবে। শুধু মাত্র শাস্ত্র চর্চাতেই হবে না, শাস্ত্র চর্চার সাথে সাথে সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস ও জপ-ধ্যান নিয়মিত করতে করতে এক সময় শাস্ত্রের অর্থগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। অর্থ যখন স্পষ্ট হতে শুরু হয়, তখন আধ্যাত্মিকতার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ আনতে হলে খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা, দৈনন্দিন জীবনচর্চায় আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে বুদ্ধিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করতে হবে।

বলছেন *অনেজদেকং* আত্মা কোথাও চলেন না, আত্মার একটাই রূপ অথচ মনের থেকেও তার গতি বেশি। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ প্রশ্ন করছেন, সব থেকে কে দ্রুতগামী? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন মনের গতি সব থেকে বেশি। আচার্য এখানে উপমা দিয়ে বলছেন মানুষ কল্পনা করলে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। মন সঙ্কল্পাত্মিকা ও বিকল্পাত্মিকা, মন সঙ্কল্প করে নিলেই চলে যেতে পারবে ব্রহ্মলোকে। আত্মা সর্বব্যাপী, মন ব্রহ্মলোকে পৌঁছে দেখবে আমার আগেই আত্মা সেখানে পৌঁছে গেছে। মন কি সত্যিই এই রকম দেখে যে আত্মা ঐখানে আগেই পৌঁছে গেছে? এখানে তা বোঝাচ্ছে না, আমার আমি বোধটাকে বোঝাচ্ছে। ব্রহ্মলোকের কথা বাদ দিয়ে যদি বলা হয় আমি এখানে লেকচার শুনছি, এখান থেকে এক্ষণে মন আমার বাড়িতে চলে গেল। এখন এই আমি বোধটা যতক্ষণ না বাড়িতে পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ মন ওখানে পৌঁছাতে পারবে না। চিন্তনের যে আমি বোধের ভাব, এই আমি ভাবটা আগে পৌঁছায়, তারপরে মন পৌঁছায়। এই আমি ভাবনাটাই হচ্ছেন আত্মা। মন প্রচণ্ড দ্রুত বাড়িতে চলে গিয়ে যখন নামছে তখন দেখে আমি আগে গিয়ে হাজির হয়ে আছে। আমি ভাবের বাইরে যখন আত্মার দিক দিয়ে দেখবে তখন আত্মা ছাড়া কিছুই নেই। আমি বোধটা না লাগালে মন লাগানো যাবে না। আমি এখানে বসে আছি, আমি এখানে লেকচার শুনছি, আমি শুনছি এই বোধটা যখন এলো, তখন আমি বোধটা আগে আসছে বলেই মনটা আসছে। মনটা যে লেকচারে লাগানো হবে তাতে আমি আগে তারপরে মন। আমি মনে মনে ভাবলাম আমি এখন হাওড়া স্টেশনে গেলাম, এই বলার সময় নয়, এখানে বাক্য দিয়ে বলা

হচ্ছে না, চিন্তন করছি মাত্র, চিন্তনের সময় আমি বোধটা আগে যায় তারপর মন সেখানে পৌঁছায়। মন সেখানে পৌঁছে দেখে আমি আগে থাকতেই সেখানে বসে আছি। অথচ আত্মা কোথাও যান না, আত্মা তো কোন নড়াচড়া করেন না, কারণ আত্মা সর্বব্যাপী। আত্মার তো ওখানে যাওয়ার কথা নয়, তাহলে কে গেছে? আমি বোধটুকু গেছে। আমি বোধটুকু যে ওখানে চলে গেল, মন যে এত দ্রুতগামী আমি বোধ তার থেকেও বেশি দ্রুতগামী। অলিম্পিকের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরকে যদি আমি বলি, আমি কিন্তু বসে থাকব তাও আমি তোমার আগে পৌঁছে যাব। কেউ এই কথা মানবে, লোকে শুনলে বলবে পাগলের প্রলাপ, কিন্তু তা নয়, বাস্তবিকই আমি এটা ঠিক বলছি।

আত্মার দিক থেকে আত্মা সর্বব্যাপী, মন যেখানেই চলে যাচ্ছে গিয়ে দেখে আত্মা সেখানে আগেই হাজির হয়ে বসে আছে। পুরানের কাহিনীতে এর খুব সুন্দর উপমা আছে, মা পার্বতী কার্তিক আর গণেশকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আগে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে সে আমার এই গলার হার পাবে। কার্তিক ময়ূরে চেপে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসে দেখে গণেশ আগেই মায়ের গলার হার পড়ে মায়ের কোলে বসে আছে। আসলে গণেশকে সাধারণত আত্মা রূপেই দেখা হয়, কার্তিককে সেনাপতি রূপে দেখা হয়, দক্ষিণ ভারতে কোথাও কোথাও কার্তিককে আত্মা রূপে দেখা হয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণত গণেশকেই আত্মরূপে দেখা হয়। এই কঠিণ গূঢ় ভাবকে খুব সহজে পুরানের কাহিনীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যিনি আত্মাকে ধরে নিয়েছেন, আত্মাকে ধরে নেওয়া মানে আত্মার সাথে এক হয়ে গেছেন, আমি যেখানেই যাই না কেন তিনি ঐখানে আগে থাকতেই আছেন। কাহিনীতে কার্তিক যদি সব জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস করত – এখানে গণেশ এসেছিল কি? তাকে বলবে, এইতো ইঁদুরের পিঠে করে কিছুক্ষণ আগেই এখান থেকে বেরিয়ে গেল।

টলস্টয়ের একটা খুব নামকরা কাহিনীতে এই ভাবটাই একটু অন্য ভাবে বলছে। দুজন বন্ধু ঠিক করল এক সাথে তীর্থে যাবে। বহু কষ্টে তারা তীর্থে চলেছে। এক জায়গায় গিয়ে দেখে সেখানকার মানুষদের মধ্যে খুব অভাব অনটন। এক বন্ধু নিজের ঘোড়া আর অন্যান্য যা কিছু ছিল সব বিক্রী করে যা টাকা-পয়সা পেল, তাই দিয়ে সেখানকার লোকেদের সেবায় লাগিয়ে দিল। সেই বন্ধুটির আর তীর্থে যাওয়া হল না। অন্য বন্ধুটি অনেক বাধা অতিক্রম করে তীর্থের পথে চলেছে। এখন সে যেখানেই যাচ্ছে দেখে ঐ বন্ধুটি একটু আগেই ওখান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। নৌকা করে নদী পার হতে যাচ্ছে দেখছে বন্ধুটি আগের নৌকা করে বেরিয়ে ঐ পারে পৌঁছে যাচ্ছে। যখনই ডাকতে যাচ্ছে দেখছে সে নাগালের বাইরে চলে গেছে। যখনই মনে হচ্ছে এইবার ওকে ধরে ফেলব, তখনই দেখে সে অন্য দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না। এই করে জেরুজালেমে মাদার মেরীর কাছে ধাক্কাধাক্কি করে পৌঁছে দেখছে বন্ধুটি ঐখানে আগেই দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে তীর্থ সেরে নিজের গ্রামে ফিরে যখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তখন তাকে বলছে, তুমি একবারও আমার সাথে তীর্থে দেখা করলে না! বন্ধুটি বলছে, আমি তো কোথাও যাইনি, আমি তো সব কিছু বেচে দিয়ে ওদের সেবা করে দেশে ফেরত চলে এসেছি। এই যে আইডিয়া, লোকটা কোথাও গেল না, অথচ গেছে। যদিও অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কাহিনীটাকে বলা হয়েছে, কিন্তু এই ধরণের ভাব সাহিত্যিকের মনেও এসেছে। তবে উপনিষদ অনেক প্রাচীন, এই ভাবগুলো পরের দিকে এসেছে। *অনেজদকং*, তিনি এক, এখানে এক মানে এই একটা টেবিল আছে এই অর্থে এক বলা হচ্ছে না, তিনিই আছেন, একরূপ, কখনই তাঁর রূপের পরিবর্তন হয় না, যেমনটি ছিলেন তেমনটিই আছেন, তেমনটিই থাকবেন। সেইজন্য তিনি *অনেজৎ* কোথাও চলেন না, অথচ *মনসো জবীয়ো*, একদিকে চলেন না আবার অন্য দিকে তিনি মন থেকেও দ্রুতগামী। কারণ সব কিছুর চিন্তা ভাবনাতে আগে এই আমি বোধটা এসে যায়। মাস্টারমশায় তাঁর নিজের ভাষায় বলছেন – ঠাকুর এখন সমাধি মন্দিরে। সমাধি মন্দিরে মানে যতই মন গভীরে যাচ্ছে, ততই দেখতে পাবো – আরে, চৈতন্য এখানে আগে থাকতেই আছে। যেখানেই যাই না কেন, আত্মা যেন এক পা মন থেকে এগিয়ে এগিয়ে চলেছে।

নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্, এখানে দেবা বলতে বলা হচ্ছে দ্যোতনা, যিনি দ্যোতন করেন অর্থাৎ যিনি আলো দেন। ইন্দ্রিয়ের যত দেবতারা আছেন এনারা কেউই পারলেন না। কি পারলেন না? *আপ্নুবন্*, তাঁকে মানে আত্মতত্ত্বকে ধরার চেষ্টা করল কিন্তু ধরতে পারল না। কেন পারল না? যেখানে আত্মতত্ত্বকে ধরার চেষ্টা করল তখনই *পূর্বমর্ষৎ*, দেখে যে তিনি আগে থাকতেই ঐখানে পৌঁছে রয়েছেন। যখন গভীর ভাবে চিন্তা করা হয় তখন দেখা যায়, আসলে মানুষ যখনই একটা জিনিষের ব্যাপারে সজাগ হয়, এই জিনিষটা এখানে আছে এই বোধ হওয়ার আগে সব সময় তার আমি বোধটা আসে, তারপর এই জিনিষটা এখানে আছে এই বোধটা আসে। উপনিষদে একটা মন্ত্র আছে যেখানে প্রথমে বলছেন *অহং অস্মি*। প্রথম চেতনা

কি হয়? আমি আছি। অজ্ঞান করে দেওয়ার পর রোগীর যখন জ্ঞান ফিরে আসে প্রথমে 'আমি'র হুঁশ আসে, তারপর তার বাকী জিনিষের বোধ আসে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আপনি বলছেন, আত্মা চলেন না, অথচ চলেন, তাঁকে ধরা যায় না, ধরতে গেলেই যেন এক পা তার থেকে এগিয়ে এগিয়ে চলে যাচ্ছেন, এগুলো কি করে সম্ভব হচ্ছে? এর উত্তরে বলা হয়, নিরুপাধিক আর সোপাধিক ব্রহ্ম, এই দুটোর তফাৎ থেকে হয়। যখন নিরুপাধিক ব্রহ্মের চিন্তা করা হয় তখন তিনি সর্বব্যাপী, সব জায়গাতেই আছেন। কিন্তু যখন ব্রহ্ম কোন রূপ আর নামের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকে বেঁধে ফেলেন তখন নিরুপাধিক ব্রহ্মই সোপাধিক ব্রহ্ম হয়ে যান, ব্রহ্ম এই শরীর মনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ মনে করছেন, কতকগুলি উপাধিকে নিজের মধ্যে আরোপ করে নেয়, এটাই হয়ে গেলে উপাধি সহিত সোপাধিক ব্রহ্ম। এবার সেই একই সত্তা দুটো সত্তা হয়ে গেল, নিরুপাধিক আর সোপাধিক। নিরুপাধিক হল অদ্বয় তত্ত্ব, সোপাধিক হল আমার মধ্যে আবদ্ধ অথচ দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। উপাধিটা কি? কাল্পনিক, কল্পনা করে নিচ্ছে। এই দুটো দৃষ্টিতে দুটোকে আলাদা করে দেখা হয়। ইন্দ্রিয় আর মনের পারে আত্মা রয়েছেন, মন হল ইন্দ্রিয়ের আর আত্মার মধ্যেকার ব্যবধান, সেইজন্য ইন্দ্রিয় কোন দিন আত্মাকে জানতে পারেনা। ইন্দ্রিয়ের পক্ষে কখনই সম্ভব নয় যে আত্মার ব্যাপারে কিছু জানতে পারবে। *পূর্বমর্ষৎ*, মানে আগে থেকেই পৌঁছে আছেন। আমাকে যদি একটা ছোট স্কেল দিয়ে বলা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটা কত বড় মেপে এস। আমি বলব এই ছোট স্কেল দিয়ে এই বিল্ডিংটা মাপা যাবে না, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিংটা এত বড় যে এইটুকু স্কেল দিয়ে মাপা যাবে না। আত্মা আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঠিক এইটাই সম্পর্ক। ইন্দ্রিয় যখন আত্মাকে ধরা বা বোঝার চেষ্টা করে তখন সে ধরতে না পেরে হাল ছেড়ে দেয়। কেনোপনিষদে এই ব্যাপারটাকেই আবার গল্পাকারে নিয়ে আসা হয়। বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র এনারা সব ব্রহ্মকে বুঝতে গেল, ব্রহ্ম তাঁদের দেখিয়ে দিলেন যে তোমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। আসলে এটাই বোঝান হয় যে, চৈতন্য সত্তাই সব কিছু, জড় সত্তার কোন অস্তিত্ব নেই। মনটাও জড় আর ইন্দ্রিয়গুলোও জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। এরপরের লাইনে বলছেন –

তদ্ধাবতোহন্যাননত্যেতি (তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অতি-এতি) এই জগতে যা কিছু প্রচণ্ড দ্রুতগতি সম্পন্ন, তাদেরকেও আত্মা অতিক্রম করে চলে যায়। আগে বলা হল *মনসো জবীয়ো*, মন থেকেও আত্মা বেশি দ্রুতগামী, এটাকেই অন্য ভাবে বলা হচ্ছে। যারাই দ্রুত গতিতে ছুটে চলে যাচ্ছে তাদের থেকেও আত্মা দ্রুত গতিতে চলেন। তারপরেই বলছেন, *তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি*। *তিষ্ঠৎ তৎ* দুটো জায়গাতে লাগান হয়েছে, আত্মা বসে আছেন কিন্তু তাতেও যে জিনিষটা দ্রুত বেগে ধাবিত হচ্ছে তার থেকেও আত্মা বেগে ধাবিত হয়ে যাচ্ছেন। আর তিনি বসে আছেন বলে, *তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি*, বায়ু অন্তরীক্ষে প্রবাহিত হচ্ছে। *মাতরি* মানে অন্তরীক্ষ 'শ্ব' মানে গমনে বা চলা, যেমন অশ্ব মানে যেটা ছুটছে। অন্তরীক্ষে কি ছুটছে? বায়ু। তাহলে কি দাঁড়াল? এই আত্মতত্ত্ব বসে আছেন বলে অন্তরীক্ষে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বাতাস যে চলছে, এটাকে আচার্য শঙ্কর এখানে ব্যাখ্যা করছেন – *অপঃ কর্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টা লক্ষণানি*, এই আপেক্ষিক জগতে যেখানে যে যা কিছু করছে, মানুষ কাজকর্ম করছে, খাওয়া-দাওয়া করছে, মেঘ বৃষ্টি দিচ্ছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে, এই যে নানান রকমের কর্ম হচ্ছে, এগুলো কেন হচ্ছে? আত্মা আছেন বলে। আত্মা যদি না থাকেন তাহলে এই সব কিছুর মধ্যে বিশৃঙ্খলা এসে সব বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বায়ুকে বলা হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ। এই বায়ু আর বৃহদারণ্যকের বায়ুর মধ্যে তফাৎ আছে। আমরা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিই, যার উপর আমাদের জীবন চলছে, এটা বায়ুর উপর নির্ভর করে, বায়ুই প্রাণ, আমাদের যা কিছু হচ্ছে সব এই প্রাণশক্তির উপর চলছে। প্রাণীর মূল হল প্রাণ, প্রাণ না থাকলে সে আর জীব হবে না। ঠিক তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ হল হিরণ্যগর্ভ, সেইজন্য হিরণ্যগর্ভের আরেকটি নাম সূত্রাত্মা। মালাতে যেমন সুতো সব ফুল বা মুক্তোকে ধরে রাখে ঠিক তেমনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূত্র হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ। এঁরই আরেকটি নাম বিধাতা, সৃষ্টিতে যিনি প্রথম জাত হয়েছেন। মানুষের যার যা প্রাপ্য সব বিধাতাই দেন। বিধাতা নিজের ইচ্ছা মতন দেন না, যার যেটা প্রাপ্য সেই অনুসারেই তিনি সবাইকে যা দেবার দেন। অনেক সময় লোকে মনে করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেই হবে। কিন্তু শাস্ত্র কোথাও বলছে না ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে ঠুকে মরে গেলেও কিছু হবে না। কারণ, বিধাতার ব্যাপারে ও কর্মের ব্যাপারে শাস্ত্র যেটা বলছে, তাতে এটা সিদ্ধ হচ্ছে না। ঠাকুরের গল্প আছে, শাশুড়ি মাটির সরাতে বৌমাদের চাল মেপে দিত। একদিন সেই মাটির সরাটা গেছে ভেঙ্গে, বৌমারা খুব খুশি। বৌমাদের খুশি

দেখে শাশুড়ি বলছে, বৌমা তোমরা যতই নাচো কোঁদো, সরা ভেঙ্গে গেলে কি হবে আমার হাতের আটকেল আছে। তুমি ঠাকুরের কাছে মায়ের কাছে যতই মাথা ঠোক, পাবে তুমি ঐটাই হাতের মাপে যেটুকু হবে সেইটুকুই পাবে, ওর বাইরে তুমি কিছুই পাবে না। এইজন্য বলা হয়, উপনিষদ হচ্ছে আমাদের প্রাণ। উপনিষদে কোন ধরণের মিষ্টি কথা, উৎসাহ দেওয়ার জন্য মনের মত কথা পাওয়া যাবে না, যেমনটা আছে ঠিক সেই রকমটাই বলছেন। বিধাতার কার্যে কখনই তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। ঠাকুর বলছেন ভাঁড়ারী থাকলে কর্তা কখন ভাঁড়ারের ঘরে যায় না। যাঁকে বিধাতা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, উনি থাকতে কখনই ঠাকুর নাক গলাবেন না। স্বামী মৃত্যু শয্যায়, ডাক্তারও হাত গুটিয়ে নিয়েছে, স্ত্রী এখন কাঁদতে বসেছে। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কেউ বলে দিল ঠাকুরকে ডাকো, তাঁর শরণাগত হও তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। স্বামী বাঁচবে কি বাঁচবে ন এটা কেউই জানিনা। এখন স্বামী যদি বেঁচে যায় তখন কিভাবে বেঁচে গেল আমরা কেউ বলতে পারবো না। তার কর্মে ছিল যে স্ত্রী ঠাকুরের শরণাগতি নিল এই কর্মের জন্য স্বামী বেঁচে যাবেন, নাকি স্ত্রীর উপর ঠাকুরের কৃপা হল, না ইচ্ছা হল, না বিধাতা পরের কর্মটাকে সামনে ঠেলে দিলেন, এগুলো আমরা কিছুই জানিনা। সেইজন্য মহাপুরুষরা বলেন জাগতিক কোন জিনিষই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে নেই, যেটা আসার সেটা নিজে থেকেই আসবে। তবে যখন দেখা যায় আর কোন গতি নেই, এবার সে মারা যাবে তখন প্রার্থনা করতে হয়।

টলস্টয়ের এই রকম আরেকটি খুব সুন্দর গল্প আছে। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন ভগবান এক দেবতাকে অভিশাপ দিচ্ছেন। বিরাট লম্বা কাহিনী, দুটো বাচ্চার জন্মের পর তাদের মা মারা গেছে। এ্যাঞ্জেল সেখানে একটু নাক গলাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ্যাঞ্জেল ভাবছে, ভগবান এই বাচ্চা দুটোর কষ্টের লাঘব করাতে ব্যর্থ, দেখি আমি এই বাচ্চা দুটোর মাকে বাঁচিয়ে এদের দুঃখকে লাঘব করতে পারি কিনা। এ্যাঞ্জেল যখন হস্তক্ষেপ করতে গেছে তখন ভগবান গেছেন প্রচণ্ড রেগে। ভগবান এ্যাঞ্জেলকে বলছেন, আমি সবাইকে দেখি না তুই দেখিস। এরপর ভগবান এ্যাঞ্জেলকে অভিশাপ দিয়ে তাকে নীচুতে নামিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এই জিনিষটাই এখানে বলা হচ্ছে, *তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি*, এই যে মাতরিশ্বা, যিনি বায়ু, সুত্রাত্মা, প্রাণসংযোগ, বিধাতা, ইনি যাকে যা দেওয়ার দিয়ে বিধাতা রূপে তিনি তাঁর কর্ম করে চলেছেন। বিধাতা কেন করছেন, তিনি মানে আত্মা আছেন বলেই করছেন। সাংখ্যেতেও এই একই জিনিষ বলা হচ্ছে, পুরুষ আছেন বলে প্রকৃতি নানা রকমের খেলা করতে পারছে। প্রকৃতি এত কিছু করছে কেন? পুরুষ আছে বলে, পুরুষ না থাকলে প্রকৃতির নড়ার ক্ষমতাই থাকবে না। প্রিপেড ফোনের মত, যত টাকা ভরা আছে সেই পরিমাণ টাকা শেষ হয়ে গেলে নিজে থেকেই ফোন বন্ধ হয়ে যাবে। সেই রকম যত কর্মফল নিয়ে এই জগতে এসেছি, সেই কর্মফল ভোগ শেষ হয়ে গেলে জীবন থেমে যাবে। এই বিধাতা তিনি *দধাতি*, তিনিই সব কিছু দেন। কি দধাতি? বিধাতা কিছুই দেননা, তিনি বিভাজতি। আচার্য শঙ্কর দধাতি শব্দটাকে নিজের থেকেই কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। বিধাতা কিছুই দেননা, তিনি বিভাজন করেন, তোমার এটা তুমি নাও, ওর যেটা সেটা ওকে দিচ্ছেন, যার যার কর্মানুসারে তিনি বিভাজন করে দিচ্ছেন। কাজ করল রামবাবু আর ফল চলে গেল শ্যামবাবুর কাছে, এই জিনিষ কখনই হবে না। এইজন্য বেদেই বলা হয়েছে বেদের ফল কর্তাকে অনুসরণ করে, যেমন বাছুর অনুসরণ করে গাভীকে। মার্কিস্টরা যে চেঁচাচ্ছে, কাজ করি আমরা আর ফল ভোগ করে মালিক শ্রেণী, শাস্ত্র কখনই এই থিয়োরি মানবে না। শাস্ত্র পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে তুমি যদি কাজ কর তার ফল তোমার কাছেই আসবে।

রিডার্স ডাইজেস্টে কিছু দিন আগে একটা লেখা বেরিয়েছিল, সেখানে বলা হচ্ছে, স্কুলের একটি ছাত্র কম্প্যুটারে এতই দক্ষ ছিল যে, একদিন স্কুল প্রশাসকদের কাছে গিয়ে বলল – আপনাদের কম্প্যুটারে একটা মস্ত গাফিলতি আছে তার ফলে যে কোন ছাত্র ইচ্ছে করলেই যেমন খুশি নম্বর বসিয়ে নিজের মার্কসীট প্রিন্ট বার করে নিতে পারবে। শুনে হেডমাস্টারের তো মাথায় হাত। ছাত্রটিকে হেডমাস্টার বললেন – তুমি এই ত্রুটিটা ঠিক করে দিতে পার? হ্যাঁ আমি পারি। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এর জন্য তুমি কত পারিশ্রমিক নেবে? ছেলেটি বলল ১২০ ডলার প্রতি ঘন্টা। তারপর সেই ছেলে দশ দিন ধরে কাজ করে যা রোজগার করল তাতে তার স্কুলের সারা জীবনের নিজের ফিস মিটিয়ে আরও বেশ কিছু রোজগার করে নিল। মানে সে নিজের স্কুল থেকে এই টাকা আয় করে নিল। এরপর আবার একদিন গিয়ে বলছে – স্কুলে আপনাদের যত স্টাফ আছে এদের সবাইকে কম্প্যুটারের ট্রেনিং দিতে হবে, তা নাহলে আপনাদের পুরো কম্প্যুটার সিস্টেম ভেঙ্গে পড়বে। এদের এখন যত স্কুল আছে তার সব মিলিয়ে প্রায় কয়েক হাজার স্টাফ হবে। ছেলেটি বলল, আপনারা যে কোন স্টাফকে দিন আমি তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওদের যে কম্প্যুটারের সব থেকে অভিজ্ঞ, যে আবার কম্প্যুটার সিকিউরিটির চিফ তার ফোন নম্বর দেওয়া হল। ছেলেটি স্কুলের প্রশাসকদের সামনেই স্পিকার অন করে চীফকে বলতে লাগল, আমি কম্প্যুটার সিস্টেম থেকে বলছি, আপনার কম্প্যুটারে কি এই রকম দেখাচ্ছে, এই জিনিষটা আসছে

বলতে বলতেই ওদের সামনে পাঁচশ টাকা আদায় করে কম্প্যুটার হ্যাক্ করে দিয়েছে। বলছে যে, যে কম্প্যুটারের চীফ্ তার কাছ থেকেই সে অত টাকা আদায় করে নিল। তখন আবার এই কাজের জন্য সে প্রচুর টাকা ফিস্ চার্জ করে রোজগার করতে থাকল, তখনও ছেলেটি স্কুলের ছাত্র। এই করে করে সে বিরাট বড়লোক হয়ে গিয়েছিল। পরের দিকে ছেলেটির জীবনে অনেক বিপর্যয় আসতে শুরু করে। তখন একটা জায়গায় গিয়ে তার মনে চেতনা এলো, আমি এইসব কি করছি! ছেলেটি এখন নতুন একটা ওয়েবসাইট খুলেছে। এই ওয়েবসাইটে বলা হচ্ছে আপনারা সবাই ভালো কাজ করুন, ওয়েবসাইটের নাম দিয়েছে 'কর্ম-পয়েন্টস্'। এই কথাটা বলার জন্যই এতো কথা বলা হল। যদি আপনি ভালো কাজ করেন তাহলে আপনার কর্মের এতগুলো পয়েন্টস্ ভালোর দিকে গেল। এই ধরণের খারাপ কাজ করলে কর্মের এতগুলো পয়েন্টস নীচের দিকে গেল।

এটাই আশ্চর্যের, কোথায় আমেরিকার একজন, যে টাকা ছাড়া কিছুই জানতো না কিন্তু কিভাবে কর্মবাদটা তাকে গিয়ে ঘিরে ফেলেছে। কর্মবাদের কথা আগে বিদেশীরা জানতই না। এখন কর্মবাদ যত বেশি প্রসার পাচ্ছে ততই মানুষের মধ্যে একটা চেতনা আসছে। সত্যিই তাই হয়, মানুষের মধ্যে যখন প্রথম আধ্যাত্মিক চেতনা জাগে তখন তার প্রথম চেতনাটা হচ্ছে এই কর্মবাদ। কর্ম কিন্তু কখনই আমাদের ছাড়বে না, ভালো হোক আর মন্দই হোক কর্ম ঠিক তার কাছে পৌঁছে যাবে, এই রূপে না গেলে সেই রূপে যাবে কিন্তু তাকে খুঁজে ঠিক বার করে নেবে। কি করে বার করে নেয়? বিধাতা সুপারভাইজার রূপে বসে আছেন। তাই বলে কি বিধাতাই শ্রেষ্ঠ? না, ভগবানই সবার উপরে। বিধাতার উপরে তিনিই আড়ালে আছেন বলেই এইভাবে কর্মের খেলা চলতে থাকে। *তিষ্ঠৎ তস্মিন্*, তিনি বসে আছেন বলেই *অপঃ*, প্রাণিদের যে চেষ্টা, মাতরিশ্বা মানে বায়ু, বায়ু বলতে এখানে হিরণ্যগর্ভ বা সুত্রাত্মা বা বিধাতা, তিনিই যার যা পাওয়ার তাকে দিয়ে দিচ্ছেন। এখানে যে মুহুর্তে এই মন্ত্রের শব্দার্থ করে দেওয়া হবে তখনই এর অর্থ পুরো অন্য রকম হয়ে আলাদা একটা দর্শন এসে যাবে। *অনেজদেকং মনসো জবীয়োর* ক্ষেত্রে আমি হয়তো বুদ্ধি খাটিয়ে বার করে নেব যে এখানে আত্মার কথ বলা হচ্ছে, আত্মার এই এই স্বভাব, *নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ* এরও অর্থ বুদ্ধি খাটিয়ে বার করে দেওয়া যাবে, কিন্তু যেই *মাতরিশ্বা দধাতিতে* যাব অর্থটাকে আর দাঁড় করান যাবে না, যতক্ষণ না আচার্যের ভাষ্যকে দেখা না হয়।

তারপর বলছেন মন ও ইন্দ্রিয়গুলো এত শক্তিশালী তাও কেউই আত্মতত্ত্বের ধারে কাছে যেতে পারবে না। মন যে এত দ্রুত গতিতে চলে সেও আত্মার গতির ধারে কাছের গতিতে চলতে পারেনা। আর বায়ু যিনি সুত্রাত্মা, পরে বায়ুকে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু উপনিষদের সময়ে যেমন বৃহদারণ্যকে বায়ুকে সূত্রাত্মা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সূত্রাত্মাও আত্মাকে ধরতে পারেনা। সূত্রাত্মা মানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি সব কিছুকে সূত্র রূপে ধরে আছেন, কারণ প্রাণ না থাকলে সব কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আবার প্রাণ হচ্ছে শক্তি, এই শক্তিকে বায়ু রূপে বলা হচ্ছে। সেইজন্য বায়ুকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভই বিধাতা। এই বিধাতাই সমস্ত জগতকে চালাচ্ছেন। কিভাবে চালাচ্ছেন? যে যেমন কর্ম করছে তাকে তার সেই কর্মের ফলটা দিয়ে। এছাড়া বিধাতা আর কিছুই চালিত করেন না, আমি যে কর্ম করছি এটা আমার নিজের চেষ্টা। কিন্তু পরের দিকে পণ্ডিতরা চিন্তা ভাবনা করে নানা রকমের তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু সোজা কথা হল তুমি যেমনটি কর্ম করবে তেমনটি ফল পাবে, আর তুমি ঠিক ততটাই পাবে যেটা তোমার প্রাপ্য। মানুষ যখন লুটপাট করতে থাকে, অশুভ কর্ম করতে থাকে, তখন বিধাতা তো এসে আর এদের সাথে মারামারি করে থামাতে যাবেন না, তিনি এদের নিজেদের মধ্যেই নানান রকমের হিউম্যান রাইটস্ এনে মারামারি লাগিয়ে দিচ্ছেন। হিউম্যান রাইটস্ নিয়ে আবার যারা বেশি বাড়াবাড়ি করছে তাদের বিরুদ্ধে কত রকমের কেস্ নিয়ে আরেক দল কোর্টে হাজির হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিধাতা কি কোন পূর্ব পরিকল্পনা করে এইসব করছেন, মোটেই না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু হচ্ছে না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় শুধু কর্ম যেটা করা হয় তার ফলটুকু সেখানে ঠিক মত পৌঁছে যাচ্ছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কাঙালী কক্ষণ কোটিপতি হবে না, কোটিপতি কখন কাঙালী হবে না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি তাই হত তাহলে সেই ঈশ্বরতো পাগল, এই রকম ঈশ্বরকে দিয়ে আমার কি হবে? পাগল কাকে বলি? যে স্বাভাবিক আচরণ করে না। স্বাভাবিকত্বটা কি? যার কাজকর্মে, কথাবার্তায়, আচরণে একটা সঙ্গতপূর্ণ ভাব বজায় থাকে। কিন্তু যার কোন কিছুতে সঙ্গতি নেই, সকালে তার এক রকম রূপ দুপুরে এক রকম আবার রাত্রে আরেক রকম আচরণ, সেতো পাগল। একজন লোক সারা জীবন ভগবানের জন্য খেটে গেল সে কিছুই পেল না, আরেকজন লোক একটু ফুল চন্দন দিয়ে কোটিপতি হয়ে গেল, এই জিনিষ কি কখন হয়? তাহলে তো সমস্ত ধর্মশাস্ত্রকে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিয়ে দিতে হবে। এই ঈশ্বর অযৌক্তিক, অসঙ্গত ঈশ্বর। আমাদের বেদান্তের ঈশ্বর পুরোপুরি যুক্তি সঙ্গত বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভালোবাসা, ভক্তি তুমি তেমনটিই পাবে যেমনটি ভাব নিয়ে তুমি কাজ করেছ।

বিধাতার ভূমিকা একটা জায়গাতে গিয়ে থেমে যায় সেটা হল মুক্তি, মুক্তির ক্ষেত্রে বিধাতার কোন ভূমিকা থাকে না। মুক্তি সম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। বিধাতার ভূমিকাকে আমরা ঈশ্বরের সাথে গুলিয়ে ফেলি। পরমাত্মা যিনি, শ্রীরামকৃষ্ণ আর বিধাতা দুজন আলাদা, এই জায়গাতে এসে অনেকে ভুল করে বসে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতাকে আমরা যে রূপে দেখি, যাকে বলা হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর, এঁরা হচ্ছেন বিধাতা, এঁরা হচ্ছেন নিয়ামক, সুপারভাইজার। কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, যাঁকে পরমাত্মা বলা হচ্ছে, তিনি নিজে এই জিনিষগুলো কখনই করেন না, তিনি কাউকে দিয়ে করান। পুরুষ নিজে কখন এগুলো করেন না, প্রকৃতিকে দিয়ে তিনিই করান। এই আপেক্ষিক জগতে বিধাতা হচ্ছেন পরমাত্মার সর্বোচ্চ প্রকাশ, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে বিধাতাই প্রথম সৃষ্ট। কিন্তু ভগবানের তো কখন জন্ম হয় না। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন, মনে হচ্ছে ভগবান যেন জন্ম নিলেন, মনে হচ্ছে তিনি কর্ম করছেন কিন্তু ভগবান জন্ম কর্মের কিছুর মধ্যেই নেই। তাহলে করছে কে? বিধাতা, তিনিই ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি। এঁকে আমি অনেক কিছু বলতে পারি, স্বয়ম্ভু বলতে পারি, প্রজাপতি বলতে পারি, ব্রহ্মা বলতে পারি, বিষ্ণু বলতে পারি। কিন্তু এই বিষ্ণু আর সেই বিষ্ণু এক নন, এই বিষ্ণু অধ্যক্ষ, সুপারভাইজার, সুপ্রিম, বিধাতার ক্ষমতাকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারবে না। বিধাতার ঠিক নীচে হচ্ছেন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ দেবতারা, দেবতাদের ক্ষমতা আরও সীমিত। আমাদের প্রায়ই মনে হবে বিধাতা যা কিছু করছেন সেটা যেন পরমাত্মাই করছেন, কিন্তু দুটোই আলাদা। পরমাত্মার শক্তিতে বিধাতা ও দেবতারা কাজ করেন। পরের দিকে কিছু কিছু দর্শনে বিধাতা আর পরমাত্মাকে এক করে দেখা হয়েছে বলে এই সংশয় এসে যায়। কিন্তু উপনিষদে দুটো পরিষ্কার আলাদা করে দেখানো হয়েছে, ভগবান ভগবানই, বিধাতা বিধাতাই। ভগবান সব কিছুর বাইরে, সৃষ্টির বাইরে, আপেক্ষিক জগতের বাইরে, যে কোন আপেক্ষিক যা কিছু আছে তার বাইরে। কিন্তু যেমনি মাঝখানে মায়া এসে জন্ম নিল, তখন প্রথম যে সৃষ্টিটা বেরিয়ে এলো, সেটাকেই বলা হচ্ছে বিধাতা মানে ব্রহ্মা। এই যে বলা হয় ব্রহ্মার বিধান, ব্রহ্মার বিধান এর মানে, তোমার কর্মের মধ্যেই তোমার যা কিছু হওয়ার হবে। ব্রহ্মা কেন কাজ করেন? ভগবান আছেন বলে, ব্রহ্মা কিন্তু ভগবান নন। আবার অন্যটাও আছে, ব্রহ্মপুরানে ব্রহ্মাকেই ভগবান বলে দেখানো হবে। সেখানেও তখন এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ভগবানের বৈশিষ্ট্য আর ব্রহ্মার বৈশিষ্ট্য এই দুটো কিন্তু আলাদা, কিন্তু আমরা এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলি বলে ভগবানের উপর এমন অনেক কিছু আরোপ করে দিই যেটা ভগবানের উপর আদৌ আরোপিত হওয়ার কথা নয়।

এই হচ্ছে মাতরিশ্বার বিশ্লেষণ। দধাতির আবার দুটো অর্থ হতে পারে, একটা অর্থ হয় বিভাজন করা, আরেকটা অর্থ হয় ধারয়তি, যিনি ধারণ করেন। বৈদিক যুগের সংস্কৃতে একটা শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয়। এখানে বলছেন, এই যে দেবতারা নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা তাঁর ভয়ে কাজ করছে। কঠোপনিষদে ঠিক একই কথা বলছেন – *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*, এই যে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, অগ্নি দাহ করছে, সূর্য আলো দিচ্ছে, তাপ দিচ্ছে কারণ বিধাতার ভয়ে। কেন বিধাতার ভয়ে? কারণ বিধাতার পেছনে সেই পরমেশ্বর আছেন বলে। বিধাতা যেহেতু নিয়ামক হয়ে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তার ফলে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা হয় না, হঠাৎ একদিন সকালে উঠে আমাকে দেখতে হবে না যে সেদিন সূর্য উদিত হয়নি, সমস্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হঠাৎ একদিন উঠে দেখলাম বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, এই জিনিষগুলো আমার কখনই দেখতে হয় না, কারণ এগুলোকে বিধাতা ঠিক মত নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে। বিধাতা একদিকে যেমন সব কর্মের ফল দিচ্ছেন, ঠিক তেমনি অন্য দিকে তিনি কর্মটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সূর্য, বায়ু, চন্দ্র যে কর্ম করা বন্ধ করে দেবেন বিধাতা তা হতে দেন না। এটা তাঁর আরেকটা রূপ, একে বলা হয় ঋতম্। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর তার সব কিছু যে নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলছে এটা হচ্ছে এই ঋতমের জন্য।

শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের যা কিছু বিকার, মানে এরা যা কিছু কাজ করছে তিনি আছেন বলে। এখানে সেই পরমাত্মা নিরুপাধিক নন, এখানে তিনি সোপাধিক। মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার মধ্যে যে সোপাধিক আত্মা অবস্থান করে ছিলেন, তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন বলে মানুষ মারা যাচ্ছে। তখন সব ইন্দ্রিয়গুলো থাকলেও কোন কাজ করতে পারেনা। মরে যাওয়ার পর যতই তার নাক দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হোক না কেন, যত ডাইলেসিস করা হোক না কেন, যতই পাম্পিং করতে থাকুক না, আত্মা বেরিয়ে গেছেন এখন কোন কিছু দিয়েই ইন্দ্রিয়কে কাজ করান যাবে না। তাহলে কে মহৎ? বায়ু মহৎ না আত্মা মহৎ?

বেদের মন্ত্রের অর্থকে বার করার জন্য একটা নিয়মের কথা বলা হয়েছিল, সেটা হল অভ্যাস, একই কথা বার বার বলা। চার নম্বর মন্ত্রে যে কথা বলা হয়েছে পাঁচ নম্বর মন্ত্রে আবার একই কথা বলা হচ্ছে। আচার্য বলছেন – একই কথা

বার বার বলতে এই মন্ত্রগুলির কখন আলস্য হয় না। মায়েরা সন্তানের উপর বিরক্ত হয়ে বলে – একই কথা তোকে কতবার বলতে হবে। কিন্তু এই মন্ত্রগুলির ঋষিরা কখনই বিরক্ত হননা, কখনই আলস্য আসে না একই কথা বার বার বলতে। ঋষিরা ভালো করেই জানতেন, আত্মতত্ত্ব বোঝা ও ধারণা করা অত্যন্ত দুষ্কর। সেইজন্য একই বক্তব্যকে একবার এইদিক থেকে বলছেন আরেকবার ঐদিক থেকে ঘুরিয়ে বলছেন, নানা ভাবে, নানান উপমা দিয়ে একই বক্তব্যকে বলতে থাকবেন। একই বক্তব্যকে পঞ্চম মন্ত্রে কিভাবে বলছেন?

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।৫

তদেজতি, তৎ এজতি, চলাকে বলে এজন্, ইনি চলেন, আবার *তন্নৈজতি, তৎ ন এজতি,* ইনি চলেন না। এখানেও সেই পরস্পর বিরোধী কথা বলা হচ্ছে। ব্রহ্ম হচ্ছেন শুদ্ধ চৈতন্য, সেইজন্য জগতের যে ধর্ম, বস্তুর যে ধর্ম সেটা ব্রহ্মের উপর খাটবে না। আত্মতত্ত্ব কখনই চলে না, অথচ মনে হয় যেন চলছে। আসলে তো তিনি চলেন না। পূর্ণিমার রাতে কখন নদী বা সমুদ্রের তীরে বসে থাকলে দেখা যায়, সমুদ্রের ঢেউ উঠছে নামছে, ঢেউয়ের উপর চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ছে। ঢেউ উপরে উঠছে প্রতিবিম্বিত চাঁদও দেখাচ্ছে যেন সেও উঠছে, ঢেউ যখন নামছে তখন চাঁদের প্রতিবিম্বও যেন নামছে, চাঁদ এখানে চলছে, তার মানে চাঁদ এজতি। যখন আকাশে আসল চাঁদের দিকে তাকাচ্ছি তখন দেখছি চাঁদ স্থির, চাঁদ ন এজতি। গগনে নিরুপাধিক চাঁদ যেটা চলে না, আর সোপাধিক চাঁদ যে চাঁদ ঢেউয়ের সাথে একাত্ম বোধ করে আছে সে আবার চলছে, একদিকে চলছে আবার অন্য দিক থেকে চলে না। আয়নার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে, এই আয়নাকে নিয়ে যদি এখন কেউ নাচাতে থাকে তাহলে সূর্যও নাচতে থাকবে। একবার সূর্যগ্রহণের সময় টেলিস্কোপ ক্যামেরা দিয়ে গ্রহণের ছবি তোলা হচ্ছিল, ক্যামেরাকে যদি স্থির ভাবে রাখা হয় তাহলে ক্যামেরার ফিল্ম সূর্যের তেজে পুড়ে যাবে, সেইজন্য ক্যামেরাকে নাচাতে থাকে। টিভিতে সেই ছবি দেখানো হচ্ছিল, যিনি সঞ্চালক ছিলেন তিনি বার বার বলে যাচ্ছিলেন – এখানে সূর্য কিন্তু নড়ছে না, ক্যামেরার ফিল্মকে বাঁচানোর জন্য ক্যামেরাটাকে নাড়াতে হচ্ছে, সূর্যের ছবিটাও তাই নড়ছে। আসলে সূর্য স্থির, টিভির পর্দায় সূর্য নড়ছে। আত্মতত্ত্বও ঠিক এই রকম সূর্যের মত স্থির। আমি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, বলছি আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। কে বেরিয়ে গেল? আমার শরীর মন ইন্দ্রিয় বেরিয়ে গেল। এখানেও প্রকৃতিই নড়ছে, কিন্তু মনে হয় যেন আত্মা নড়ছেন। আত্মার নড়ার কোন জায়গাই নেই তাই আত্মা নড়বেন কোথায়। এই রকম অনেক উপমা দিয়ে এই আত্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা যায়। রাত্রিবেলা ট্রেনে করে যাচ্ছি, আকাশে চাঁদ উঠেছে, চাঁদের দিকে তাকালে মনে হবে চাঁদটাও যেন ট্রেনের সাথে সাথে চলছে। দূরের গাছপালা, ঘরবাড়ি সব যেন চলছে। কিন্তু সব কিছুই স্থির আমিই চলছি।

তদ্দূরে তদ্বন্তিকে, যারা অজ্ঞানী, যাদের মন পুরোপুরি ভোগের মধ্যে পড়ে আছে তাদের থেকে আত্মতত্ত্ব অনেক দূরে। এগুলো সবই আচার্যের ব্যাখ্যানুসারে বলা হচ্ছে। অন্যান্য যারা পণ্ডিত আছেন তারা এটাকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, কিন্তু তার কোন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ একটা ভাবকে আশ্রয় করে ধরে না রাখা হয়, ততক্ষণ সেই ব্যাখ্যা চলবে না, পণ্ডিতদের দেখা যায় উপনিষদের কোন মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজের ব্যাখ্যাটাও জুড়ে দেন, উপনিষদের ব্যাখ্যাতে কখনই এই জিনিষ করা চলে না। যেমনটি আচার্য বলেছেন ঠিক তেমনটি রেখে তারপর নিজের পছন্দ মত জুৎসই উপমা লাগিয়ে দেওয়া যায়। যেমন *তদ্দূরে তদ্বন্তিকের* ক্ষেত্রে বলা যায় আত্মতত্ত্ব দূরেও আছেন আবার তিনি কাছেও আছেন, এটাও একটা ব্যাখ্যা কারণ আত্মা সব জায়গাতেই, আত্মা সর্বব্যাপী। আচার্য কিন্তু তা বলছেন না, যারা অজ্ঞানী তাদের থেকে আত্মতত্ত্ব দূরে, যারা জ্ঞানী তাদের কাছে আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত নিকটে। যখনই *তদ্দূরে* এই ভাবটা এসে যায় তখনই আচার্য শঙ্কর একেবারে নিজের ভাবের মধ্যে চলে আসেন, তখন তিনি বলবেন – শত শত কোটি কোটি বছরেও অজ্ঞানীরা এই আত্মতত্ত্বের কাছে যেতে পারবে না, সেইজন্য আত্মতত্ত্ব অনেক দূরে, এই ব্যাপারে আচার্য একেবারে দৃঢ়। কিন্তু যাঁরা বিদ্বান, পণ্ডিত, পণ্ডিত মানে যাঁরা আত্মতত্ত্ববিৎ, তাঁদের কাছে আত্মাই তো সব কিছু, সেইজন্য আত্মতত্ত্বই সব থেকে কাছে। তাঁর মন, বুদ্ধিটা অবশ্য তার বাইরে, আত্মতত্ত্বটা এখানে আমি বোধটা, মানে শুদ্ধ আত্মা যেই রকমটি এই ভাব।

এরপর বলছেন *তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ*, ইনি হচ্ছেন সবারই ভেতরে। সবারই ভেতরে এটা কি করে সিদ্ধ হবে? আচার্য কোথাও তাঁর নিজের বুদ্ধিকে লাগাচ্ছেন না, এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। যা বলার তিনি বেদ থেকে উল্লেখ করেই বলবেন। একবার যখন বেদের কথা উল্লেখ করে বলে দেওয়া হয়ে যাবে তারপর তিনি সেটাকেই নিজের বুদ্ধি দিয়ে সেই জিনিষটাকে গুছিয়ে সুন্দর করে উপস্থাপনা করে দেবেন। এখানে তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে তুলে নিয়ে বলছেন – *যঃ আত্মা সর্বান্তঃ*, এই আত্মা সবারই ভেতরে আছেন। উনি কখনই এই কথা বলবেন না যে, তোমার যে আমি বোধ এটা এইজন্য যে আত্মা তোমার ভেতরে আছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করে নিচ্ছেন তা নয়, নেবেন যখন বৌদ্ধদের সাথে যুক্তি তর্ক করতে করতে অনেক সময় তখন তিনি বিভিন্ন সময় যুক্তি দিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু আচার্যের বক্তব্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে – বেদে এটা বলা আছে যে *আত্মা সর্বান্তঃ*, আত্মা সবারই ভেতরে আছেন। উপনিষদের যে ভাষ্য দিচ্ছেন এখানে আচার্য বৌদ্ধদের লড়াই করার জন্য দিচ্ছেন না, এখানে তিনি উপনিষদের অর্থটা কি, উপনিষদ আমাদের ঠিক কি বলতে চাইছে এই অর্থটা বলে দেওয়াটাই তাঁর উদ্দেশ্য। চার্বাক, বৌদ্ধ বা পূর্বমীমাংসকদের সাথে লড়াই করার জন্য ভাষ্য লেখা হচ্ছে না, তার জন্য তিনি ব্রহ্মসূত্রে সব করে রেখেছেন। এখানে শুধু তিনি উপনিষদের মন্ত্রের ঠিক ঠিক অর্থটা কি দেখাচ্ছেন।

এখন যদি দশ জন সন্ন্যাসী মিলে বিচার করতে বসেন ঠাকুরের ভাব কি, একজন বলছেন ঠাকুরের এই ভাব, আরেকজন বলছেন এই ভাব। কিন্তু যে যাই বলুক, দশ জন মিলে যতই মারিমারি করুক, ঠাকুরের যদি অর্থ বার করতে হয় তাহলে তাদের বলতে হবে আমরা ঠাকুরের কথামৃত ছাড়া আর কিছু মানিনা। তাই যদি বলা হয় তাহলে ঠাকুরের ভাবের অর্থ বার করতে হলে কথামৃতকে আধার করেই করতে হবে, কথামৃতের বাইরে কিছুতেই যেতে পারবে না। ঠিক তেমনি উপনিষদের অর্থ বার করতে হলে বেদকে আধার করেই বার করতে হবে। সেইজন্য তিনি বেদ থেকে নিয়েই বলছেন যে, *আত্মা সর্বান্তঃ*, এই আত্মা সবারই ভেতরে আছেন, সেইজন্য *তদন্তরস্য সর্বস্য*, তিনি এই সমস্ত জগতের অন্তরে। সবার ভেতরে ও বাইরে তিনিই আছে। কে আছেন? আত্মা।

এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, আচার্যের লড়াইটা মূলতঃ হচ্ছে কর্মকাণ্ডীদের অর্থাৎ পূর্বমীমাংসকদের বিরুদ্ধে। যা কিছুই তিনি বলছেন সব পূর্বমীমাংসকদের বিরুদ্ধে বলছেন। ঈশাবাস্যোপনিষদ শুক্লযজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায়, ঊনচল্লিশটি অধ্যায় ব্যবহার হয় যজ্ঞে কিন্তু এই চল্লিশতম অধ্যায় যজ্ঞে ব্যবহার হয় না। কর্মকাণ্ডীরা এই অধ্যায়কে স্তুতি হিসাবে যজ্ঞের সময় পাঠ করেন, যাতে যজ্ঞ আর শক্তিশালী হয়। এবার আচার্য বলছেন এটাতো উপনিষদ, পরম্পরাতে একে উপনিষদ রূপেই দেখা হয়ে আসছে। কর্মকাণ্ডীরা বলবে, উপনিষদ কিছুই নয়, এটা শুধু জয় জয় করা। যেমন রান্না করার পর উপর থেকে একটু ঘি ছিটিয়ে রান্নাতে একটু সুগন্ধটা বাড়ান হল, এ ছাড়া এই উপনিষদের আর কোন গুরুত্ব হতে পারেনা। আচার্য বলবেন, কিন্তু আসলে তা নয়, এই চল্লিশতম অধ্যায়ে যা বলা হচ্ছে এটাই সত্য। এর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত একই কথা বলা হচ্ছে, শুধু তাই নয়, তোমরা বেদের অর্থ বার করার জন্য যে ছটি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছ, ষড়লিঙ্গ, তোমাদের দেওয়া ছটি নিয়ম উপক্রম, উপসংহার, অপূর্বতা, অভ্যাস ইত্যাদি লাগিয়ে ঈশাবাস্যোপনিষদের অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? আত্মতত্ত্ব।

এখন হঠাৎ এখানে এসে বলছেন, *তদন্তরস্য সর্বস্য*। এর আগেও যখন অন্য ভাবে বলা হয়েছিল সেখানেও তিনি অন্যান্য জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এবার যখনই এসে গেলো ভেতরেও তিনিই আছেন, তখনই পূর্বমীমাংসকরা আবার কোমড় বেঁধে আচার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে, আমরা মানিনা তিনি ভেতরে আছেন। আত্মা সম্বন্ধে পূর্বমীমাংসকদের যে ধারণা আর বেদান্তীদের আত্মা সম্বন্ধে যে ধারণা সেটা পুরোপুরি আলাদা। পূর্বমীমাংসকদের আত্মা হচ্ছেন অশুদ্ধ, পাপবিদ্ধ আর সীমিত। এরা বলে তুমি যত ভালো কর্ম করতে থাকবে, ঠাকুরের নাম করতে থাকবে তখন এই অশুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ হতে থাকবে। কর্মকাণ্ডী ছাড়া এই মতে আর কারা চলে? খ্রীশ্চানদের মত, মুসলমানদের মত। এটা কিন্তু বেদান্তের মত নয়। বেদান্তের মত হচ্ছে, আত্মা শুদ্ধ, নিত্য শুদ্ধ, সব সময়ই শুদ্ধ, তিনি অপাপবিদ্ধ, তিনি অনন্ত। যিনি সেই শুদ্ধ আত্মা, তিনিই ভেতরে আছেন, *তদন্তরস্য সর্বস্য।* এর কি প্রমাণ আছে? আমি কি তোমাদের শুধু ঈশাবাস্যোপনিষদের কথাই বলছি? বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলছে। এখানে আচার্য যে শুধু একটা জায়গা থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছেন তাই নয়, তিনি দরকার পড়লে আরও দশটা জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন এর অর্থ এই রকমই হবে।

এরপর বলছেন *তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ,* তিনি তো ভেতরে আছেন আর বাইরে যত নাম ও রূপ সম্বলিত ক্রিয়াত্মক জগৎ যেটা সেটাও তিনি, তিনি ছাড়াতো আর কিছু থাকতে পারেনা। এখানেও তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। আচার্য বলছেন সূক্ষ্ম রূপে তিনি সবার ভেতরে আর ক্রিয়াত্মক রূপে তিনি বাইরে, তাই বাইরেও তিনি ভেতরেও তিনি। এখানে আবার বৃহদারণ্যক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আচার্য বলছেন, তিনি একেবারে ঘনীভূত চৈতন্য, বাইরেও তিনি ভেতরেও তিনি, মাঝখানে যেটা নিরন্তর সেটাও তিনি, কোথাও কোন ধরণের কোন বিভাজন নেই, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা অজ্ঞানী বলে এই শরীরটাকে একটা দেওয়াল রূপে দাঁড় করিয়ে একটা ব্যবধান তৈরী করে আমি আর তুমি নিয়ে আসি। যুস্মদ্ আর অস্মদ্ প্রত্যয় দিয়ে জগৎ আর আমাকে আলাদা করে দিয়ে দেখছি জগৎ আলাদা আমি আলাদা। আচার্য বলছেন, বাইরে যেটা সেটাও আত্মা ভেতরে যেটা সেটাও সেই আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। শরীর মন যেটা দেখছি এটা অজ্ঞান প্রসূত দেখা, অজ্ঞানে কোন কিছুকে দেখা মানে সেটার বাস্তবিক কোন সত্তা নেই, শরীর মন সবই কাল্পনিক, অজ্ঞানের জন্য এই মিথ্যা কল্পনাটা এসেছে।

পূর্বমীমাংসকদের একটা শর্ত হল, যদি ঈশাবাস্যোপনিষদ বেদ হয় তাহলে এর একটা ফল থাকতে হবে, উপসংহার এই নিয়মের এটি একটি শর্ত। অভ্যাস থাকতে হবে, মানে একই কথা বার বার বলা হবে। অপূর্বতা, এমন জিনিষ করতে হবে যেটা বুদ্ধি দিয়ে, মন দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, এখানে যে আত্মতত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে তাকে এগুলোর কিছু দিয়েই জানা যাবে না। উপপত্তি করতে হবে, অর্থবাদ, মানে প্রশংসা করতে হবে, যদি তুমি আত্মতত্ত্ব না জানতে পারো তাহলে তুমি নরকে যাবে, আত্মতত্ত্বের প্রশংসা হয়ে গেল। এইসব করার পর শেষে আসছে ফল, তুমি হয় দৃষ্ট ফল দাও নাহলে অদৃষ্ট ফল দাও, তুমি এই জগতে হয় সুখ দাও তা নাহলে কোন উচ্চ স্বর্গে আমাকে নিয়ে চল, কিছু একটা ফল দিতে হবে। এবারে আত্মতত্ত্ব কি ফল দেবে, আত্মতত্ত্ব জেনে গেলে তার কি ফল হবে সেটাই ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে বলা হবে। এইভাবে আচার্য বেদের অর্থ নিরুপণ করার যা নিয়ম, ঠিক সেই নিয়মকে অনুসরণ করে ঈশাবাস্যোপনিষদের অর্থ বার করলে ঠিক এই রকমটি দাঁড়ায়। এখানে আচার্য পূর্বমীমাংসকদের ঠিক বিরুদ্ধে না গিয়ে তাদের নিয়ম দিয়েই তাদের থেকে আলাদা অর্থ বার করলেন। ঠিক তাই হল, আজকের দিনে কজন হিন্দু আর শুক্লযজুর্বেদকে জানে, কিন্তু বেশির ভাগ হিন্দু ঈশাবাস্যোপনিষদ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে। অবতারের কথা আর পণ্ডিতের কথাতে এই পার্থক্যটাই হয়। আচার্য শঙ্কর অবতার, অবতার বলে দিলেন চল্লিশতম অধ্যায়টাই আসল, এটাই বেদান্ত, চল্লিশতম যা বলছে এটাই সত্য। তাই যারাই শাস্ত্র পাঠ করে তারাই ঈশাবাস্যোপনিষদ অবশ্যই পড়ে। গান্ধীজী গীতা মুখস্ত করার আগে ঈশাবাস্যোপনিষদ মুখস্ত করেছিলেন। অথচ যারা কর্মকাণ্ডী তাদের কাছে এটা হারিয়ে গিয়েছিল, কর্মাকণ্ডীদের প্রভাব থাকলে এই উপনিষদ হারিয়েই যেত। অবতার দেখিয়ে দিলেন, তাঁর কথার দাম আছে, তিনি দেখিয়ে দিলেন এই উপনিষদ যাজ্ঞবল্কের সময় থেকেই পরম্পরায় চলে আসছে।

আত্মতত্ত্ব নিয়ে তো আপনি অনেক আলোচনা করলেন কিন্তু এর ফল কি পাওয়া যাবে? এর উত্তর ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে বলে দেওয়া হচ্ছে –

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।৬

আচার্য প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, এই মন্ত্রগুলো সবার জন্য নয়। একমাত্র পরিব্রাজক মুমুক্ষুদের জন্যই এই মন্ত্র। যে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, সন্ন্যাস নিয়ে পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই মন্ত্রগুলো তারই জন্য। এখানে আমাদের বলে দেওয়া দরকার উপনিষদের উপদেশ কোন নীতি-শাস্ত্র নয়, কিন্তু অনেকে উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে গায়ের জোরে নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক নীতির শিক্ষা, সামাজিকতার আদর্শ রূপে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু আমাদের পরম্পরার গোঁড়া ভাষ্যকাররা কখনই এই জিনিষকে সহ্য করবেন না। তাঁদের কাছে একেবারে পরিষ্কার, উপনিষদ মানব জীবনের দুটি পথকে দেখাচ্ছে। দুই ধরণের মানুষদের জন্য দুটো আলাদা পথ ঠিক করে দিচ্ছেন। সন্ন্যাসী, যারা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে অবলম্বন করেছেন, আর গৃহস্থ, যারা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের পথকে বেছে নিয়েছেন। এর সাথে সাথে বার বার একটা কথা

এনারা বলবেন, এই দুটো পথে কোথাও কোন ধরণের মিল নেই। এই দুটো ধর্মের মাঝখানে যেন একটা বিশাল পাহাড় দাঁড়িয়ে দুটোকে আলাদা করে রেখেছে। এই দুজনের সব কিছুই আলাদা, এদের সাধনার পদ্ধতি আলাদা, জীবন-ধারা আলাদা, এর ফল আলাদা, সব ক্ষেত্রেই পৃথক, কোথাও এদের মধ্যে কোন মিল নেই। কিন্তু যারা পূর্বমীমাংসক, যারা নিজেদের শুক্লযজুর্বেদের কর্তা মনে করে, তারা বলবে – তুমি নিজের খুশি মত গায়ের জোরে এর অর্থ বার করে বলে দিলে এই বেদের চল্লিশতম অধ্যায়ের এই মন্ত্র সন্ন্যাসীদের জন্য। কেন এই সমস্যা বারে বারে আসছে? তার কারণ বেদের বিভাজনের মধ্যেই এই সমস্যা লুকিয়ে আছে। বেদের চারটে বিভাজন, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ। সংহিতা আর ব্রাহ্মণ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, সংহিতা আর ব্রাহ্মণ যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়। আরণ্যক আর উপনিষদ হচ্ছে উপাসনা। কর্মকাণ্ডীরা বলে আরণ্যক আর উপনিষদ বেদের লেজ, মানে বেদে এই দুটোর কোন গুরুত্ব নেই। অথচ ঈশাবাস্যোপনিষদ সংহিতাতে এসে গেছে কিন্তু যজ্ঞে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কি করে ব্যবহৃত হবে! যেখানে এই ধরণের মন্ত্র আছে – *যস্য সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি*, যে সমস্ত জীব জগতের মধ্যে নিজেকেই দেখছে আর *সর্বভূতেষু চাত্মানং* সব জীবকে নিজের মধ্যে দেখছে সে তখন *ততো ন বিজুগুপ্সতে*, কাউকে ঘৃণা করে না। এই মন্ত্র দিয়ে কি যজ্ঞ হবে? সেইজন্য তারা এইসব মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞ না করে কিছু কিছু যজ্ঞে শুধু পাঠ করার জন্য ব্যবহার করত। এরা মনে করে এই মন্ত্রগুলো পাঠ করলে যজ্ঞের শক্তিটা বেড়ে যায় কিন্তু পাঠ করাটা বাধ্যতামূলক নয়।

আচার্য তখন ব্যাখ্যা করে বলছেন, এই মন্ত্রতো যজ্ঞে ব্যবহার করার জন্য নয়, কারণ এটা সন্ন্যাসীদের জন্য। অন্য দিকে কর্মকাণ্ডীরা সন্ন্যাসকে মানেই না। ঈশাবাস্যোপনিষদের যা কিছু অর্থ আচার্য শঙ্কর রাখছেন এগুলোকে তারা মানবেই না, বলবে এগুলো সব ফালতু বক্‌বক্‌, এগুলোকে বাদ দাও, সন্ন্যাস বলে কিছু আছে নাকি! তখন আচার্য শঙ্কর সব কিছুকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখাতে শুরু করেছেন। আচার্য বলছেন, এই যে মন্ত্রগুলো তোমরা দেখছ এগুলো সব সন্ন্যাসীদের জন্য, সন্ন্যাসীদের এই মন্ত্রগুলো সব সময় পালন করতে হয়। কি পালন করতে হয়? *সর্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তনি*, একেবারে অব্যক্ত ব্রহ্মা থেকে নিয়ে একটা পাথরের টুকরো পর্যন্ত আত্মার বাইরে কোন কিছু নেই। যা কিছু আছে সব আত্মা, যা কিছু ছোট বড় বলে দেখছ এগুলো আত্মার কোনটা বড় ঢেউ, কোনটা ছোট ঢেউ, তাঁর বাইরে কিছু নেই। এই বোতলকে তিনি বোতলেই দেখছেন কিন্তু সাথে সাথে তিনি দেখছেন বোতলের যে বাস্তবিক সত্তা সেটা সেই আত্মারই একটি রূপ, এইভাবেই আত্মা এখানে নিজেকে ব্যক্ত করছেন। আমরা দেখছি আমরা আলাদা বোতল আলাদা, আমার সত্তা আলাদা বোতলের সত্তা আলাদা। কিন্তু যিনি মুমুক্ষু, যিনি এখনও জ্ঞান লাভ করেননি, আত্মবিৎ নন যদিও তিনি এই পথে আছেন, তাঁরা বলেন, আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনিই সর্বব্যাপী, এই বোতলটাও তাঁরই রূপ। এখানে আমি আর আপনি কিন্তু এক বলা হচ্ছে না, আমি আর বোতল এক নই। আমরা কোথায় এক? পারমার্থিক সত্তাতে, পারমার্থিক রূপে আমরা এক, আর পারমার্থিক রূপটাই আসল রূপ।

পারমার্থিক রূপে মুমুক্ষু সন্ন্যসী কোন কিছুকে আত্মা থেকে পৃথক দেখেন না, আর জানেন সেই আত্মাই আমার ভেতরে আছেন এবং সমস্ত ভূতের মধ্যে সেই আত্মাই বিরাজিত, আমি তাঁতে আছি তিনি আমাতে আছেন, তার মানে আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। আচার্য এর অর্থ স্পষ্ট করে বলছেন, আমার যে ঠিক ঠিক আমি, *যথা অস্য দেহস্য কার্যকারণ সংঘাতস্য আত্মা অহম্‌*, আমি যখন বলছি 'আমি', এই 'আমি' বলতে আমি কি বুঝছি? দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের সংঘাত থেকে যে আমি বোধ হচ্ছে তাকেই আমি মনে করছি। এখানে আচার্য মতটাকে পাল্টে দিয়ে বলছেন, দেহ, মন আর ইন্দ্রিয়ের সংঘাত থেকে আমি আমি ভাব উঠছে। পুরো গোলমালটা তো এই একটা শব্দের জন্য, যারা চার্বাক বা বস্তুবাদী তারা বলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় এইগুলোই আমি, আর বেদান্তীরা বলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের কার্যকারণের যে আত্মা ঐটাই আমি। এই ছোট্ট একটা তফাৎ এর জন্য সব কিছু পাল্টে যায়। তাহলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়গুলো কি? এগুলো কিছুই নয়, আত্মার উপর খেলা করছে। আলেকজণ্ডার যখন ঋষিকে বলল, তুমি যদি আমার সাথে না যাও তাহলে আমি তোমাকে বধ করে দেব। ঋষি বলছেন, তোমার জীবনে এর আগে পর্যন্ত তুমি এত বড় মিথ্যা কথা বলোনি, আত্মাকে তুমি কিভাবে নাশ করতে পারবে, আমি তো সেই আত্মা। হ্যাঁ, তুমি আমার দেহের নাশ করে দিতে পার, আমিতো দেহ, মন, ইন্দ্রিয় নই। আমি হচ্ছি সেই আত্মা, যে আত্মাকে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় লুকিয়ে রেখেছে। প্রত্যগাত্মা রূপে, ভেতরে যে আত্মা রূপে আমিটা আছে আসল আমিটা সেই। সেই আমিটা আবার কি? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সাক্ষী, সেটাও আমি। বেদান্ত মতে চৈতন্য সত্তা কখনই দুই হবে না।

তাহলে মূল কি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন? যিনি এই শরীরের ভেতরে আছেন, আমার যে আসল আমিটা সেটা তাই। তিনিই আবার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী। যেমন তিনি এই দেহ, মন, বুদ্ধির সাক্ষী, ঠিক তেমনি এই একই ভাবে তিনিই আবার পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী। এখানে এই ছোট্ট শরীরের সাক্ষী, সেই তিনিই আবার এই জগৎ এর সাক্ষী, এরও সাক্ষী ওরও সাক্ষী, এতে তফাৎ কিছু নেই। এটা খুবই সাধারণ জিনিষ, একটা সমুদ্রে অনেক ঢেউ। সেই ঢেউয়ের উপরে আমি অনেকগুলো বেলুন ভাসিয়ে দিলাম। ঢেউয়ের সাথে সাথে বেলুনগুলো লাফাচ্ছে। বেলুনের লাফালাফি সমুদ্রের শক্তিতে। শক্তিরূপে এক কিন্তু বেলুনগুলো আলাদা। আসল জিনিষটা এক, সেই সমুদ্রই আছে, আত্মাটাই সত্য। এখন যদি একটা বেলুনের চেতনা জাগে তখন সে দেখতে পাবে এই বেলুনের যা কিছু হচ্ছে পেছনে সমুদ্র আছে বলে আর আমার বাস্তবিক সত্তা সেই সমুদ্র। আরও ভালো উপমা হবে, যদি আমি নর্থ পোলের দিকে চলে যাই সেখানে দেখব জল জমে বরফ হয়ে আছে। বরফের চাঁইগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ে লাফাচ্ছে। হঠাৎ একটা বরফের চাঁইয়ের চেতনা হতেই বলছে, আমি বরফ রূপে আলাদা হতে পারি কিন্তু আমিতো সেই সমুদ্র, আর যত বরফের চাঁই আছে এগুলোও আমিই। জল রূপে, সমুদ্র রূপে বরফের চাঁই সবাই এক, কিন্তু বরফ রূপে সবাই আলাদা। আমরাও সবাই দেহ রূপে আলাদা কিন্তু সত্তা রূপে এক।

যখনই বুঝে গেল আমরা তো সত্তা রূপে এক, তাহলে আমরা কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে মরছি! হিন্দী সিনেমাতে এই জিনিষ প্রায়ই দেখা যায়, দুই ভাই ছোটবেলাতেই কোন এক কারণে আলাদা হয়ে গেছে। বড় হয়ে এক ভাই হয়েছে হিরো, আরেক ভাই ভিলেন। দুজনে মারামারি করছে, হঠাৎ তাদের মা এসে দেখছে তারই দুই ছেলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। তখন মা গিয়ে দুই ভাইকে বলছে, আরে তোমরা একি করছ, তোমরা দুই ভাই, আমারই সন্তান তোমরা। তখন দুই ভাই মারামারি ফেলে গলা জড়াজড়ি করছে। এইটাই এই মন্ত্রে বলছে, যখন দেখে নিল সর্ব ভূতে আমিই আছি আর আমার মধ্যেই সর্বভূত বিরাজিত, তখন কি হবে? *ততো ন বিজুগুপ্সতে*, তখন কে কাকে ঘৃণা করবে, কে কাকে হিংসা করবে। *বিজুগুপ্স* শব্দের দুটো অর্থে হয়, একটা হয় গোপন করার ইচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ঘৃণা করা। আচার্য এখানে ঘৃণার অর্থেই নিয়েছেন, ঘৃণা করে না মানে কাউকে সে তাচ্ছিল্য করে না, কারুর প্রতি তার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী আসে না। কোন কোন ভাষ্যকাররা টীকাতে দেখিয়েছেন যে, বিজুগুপ্স শব্দকে গোপন করার ইচ্ছাতেও যদি নেওয়া হয় তাহলেও ভাবটা একটা জায়গাতে গিয়েই দাঁড়ায়। মানুষ কখন কোন কিছুকে লুকোতে বা গোপন করতে চায়? যখনই কেউ ভয় পায় তখনই সে কোন কিছুকে লুকোতে চায়। ঠাকুরের একবার হাত ভেঙে গিয়েছে। ঠাকুরের কাছে লোকজন আসছে, রাখাল এসে ঠাকুরের বার বাঁধা ভাঙা হাতটা চাদর দিয়ে ঢাকা দিচ্ছে। ঠাকুর বুঝতে পেরেই সবার সামনে চেঁচাচ্ছেন, ওগো তোমরা দেখগো আমার হাত ভেঙে গেছে। *ততো ন বিজুগুপ্সতে*, আমিও যা তুমিও তা, এখানে আর লুকনোর কি আছে। গোপনের ইচ্ছা মানে জুগুপ্সা, জুগুপ্সা শুধু দুজনের থাকে না। একজন হচ্ছে যারা মহামুর্খ বা মহাবোকা, কি রকম বোকা? বাবু চাকরকে বলে দিয়েছে, কেউ আমাকে ডাকলে বলবি আমি বাড়ি নেই। একজন এসে ডেকেছে, চাকর বলছে, বাবু বলে দিয়েছেন বাবু বাড়ি নেই। চাকর মহাবোকা জানেই না লুকনো কাকে বলে। কথামৃতে আছে, বাচ্চা ছেলে নিজে শৌচ করে এসে সবাইকে পেছন ফিরে দেখাচ্ছে দ্যাখো তো আমার পরিষ্কার হয়েছে কিনা। বাচ্চার মনে কোন বিকার নেই বলে গোপন করার কিছু নেই। আর দ্বিতীয় মহাপুরুষদের গোপন করার ইচ্ছা থাকে না। মহাপুরুষ দেখছেন সবটাই আমার আত্মা, কাকে কোথায় কিভাবে লুকবো, সেইজন্য তাঁদের লুকোবার কোন ব্যাপারই থাকে না। ঠাকুরকে নিয়ে মথুরবাবু এদিক সেদিক অনেক জায়গাতেই যেতেন। মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন – বাবা, আজ তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল? ঠাকুর বলছেন, আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে গিলে, সেখানে আমি আর মথুর বসলাম। কিছুক্ষণ পর একটা খুব সুন্দরী মেয়ে, বড় বড় চোখ, আমাদের কাছে এলো, বাবু তার সাথে ভেতরে চলে গেল, আমি বসে রইলুম। জগদম্বা দেবী যা বোঝার বুঝে নিলেন। কোন কিছু যে ঠাকুর লুকিয়ে রেখেঢেকে বলবেন সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভবই না। আসলে আমরা যখন কোন কিছুকে অপছন্দ করি, ঘৃণা করি, তখন তাকে লুকোনর ইচ্ছে হয়। আত্মবিৎ যিনি, তাঁর অপছন্দের বালাই নেই, কারণ সর্বভূতের মধ্যে তিনি নিজেকেই দেখছেন। আমি আর তুমি কি আলাদা! আমরাও তাই করি, যাকে আমার বন্ধু বলে মনে করছি, কাছের আপনজন মনে করছি তাকে আমরা সব কিছু বলে ফেলি। কিন্তু আমাদের একটা সীমানা আছে, তার বাইরে আমরা সব কথা বলতে যাই না। *বিজুগুপ্সতে* যেমন ঘৃণার অর্থে নেওয়া যায়, আর লুকনোর ইচ্ছেতে নিলেও ভাবের ও অর্থের কোন হেরফের হবে না। কিন্তু আচার্য এখানে বিজুগুপ্সতের অর্থকে ঘৃণার অর্থেই নিয়েছেন। যারা বিধর্মীদের গলা কেটে দিচ্ছে তারাও এই ঘৃণার ভাব থেকেই করছে, যারা আমার ধর্মকে মানছে না তাদের গলা কেটে দাও। কিন্তু হিন্দুধর্মের শাস্ত্রেই বলছে *ততো ন বিজুগুপ্সতে*, আমিও যা তুমিও তা আমাদের মধ্যে ঘৃণা আসবে

কিভাবে! সেইজন্য হিন্দুদের মধ্যে অহিংসার ভাবটা খুব গভীরে ভাবে বসে গেছে, হিন্দুধর্মে এই কারণে অন্য কোন ধর্ম বা জাতিকে আক্রমণ করার প্রবৃত্তি নেই বলে কারুকে আক্রমণ করার ক্ষমতাটাই নেই, এরা এইভাবেই ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পেয়ে বড় হয়েছে। হিন্দুধর্মের উৎস হচ্ছে বেদ, বেদেই বলা হচ্ছে তুমি কাউকে ঘৃণা করো না। হিংসাতো দূরের কথা কাউকে ঘৃণা করতেই জানেনা। কিছু পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবিরা বলে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পর থেকেই আমাদের মধ্যে অহিংসার ভাব, কাউকে ঘৃণা না করার ভাবটা এসেছে। কিন্তু এরা কিছু একটা পড়ে নিয়ে এইসব উদ্ভট মন্তব্য করে, অহিংসা, বিজুগুপ্সতা এগুলো আমাদের বেদেরই প্রথম অবদান, বেদের সময় থেকেই আমাদের মধ্যে এই ভাব সুদৃঢ় হয়ে বসে গেছে। কিন্তু এদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় বৌদ্ধধর্মে কেন হিংসা করতে নিষেধ করা হচ্ছে এর পেছনে কি যুক্তি আছে, কিছুই বলতে পারবে না। কিন্তু এখানে পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে দেখান হচ্ছে কেন তুমি কাউকে অপছন্দ করবে না, তুমিও যা সেও তাই, আমরা এক সত্তা, সেইজন্য কাউকে ঘৃণা করো না, কাউকে কষ্ট দিওনা, কারুর প্রতি হিংসা করো না। কিন্তু তাহলে আমি বাঁচবো কি করে, আমাকে তো খাওয়া-দাওয়া করতে হবে! যার খাদ্য মাছ মাংসের উপর নির্ভর, সে তাহলে কি করবে? সে অবশ্যই মাছ মাংস খাবে, কিন্তু তোমার শরীরের জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই নেবে, তার বাইরে একটুকুও নেবে না। আর তার বদলে তুমি প্রায়শ্চিত্ত করবে, অর্থাৎ সমাজে তুমি ততটুকু ফেরত দিয়ে দেবে। যারাই খাওয়া-দাওয়া করতে গিয়ে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের অপচয় করে তারা ঘোর পাপী, ভাতের একটি দানাও যেন কোন ভাবে নষ্ট না হয়। যারা গত জন্মে বাঘ বা শকুন ছিল, মনুষ্য জন্মে এসে মাংস খাওয়ার সংস্কারটা তার থেকে যাবে, সেইজন্য হিন্দুধর্ম কখনই মাংস খেতে নিষেধ করছে না, তুমি অবশ্যই খাবে কিন্তু অতটুকুই খাবে যতটুকু তুমি প্রায়শ্চিত্ত করে বিশ্বের ভারসাম্যকে বজায় রাখার জন্য ফেরত দিতে পারবে। এর কারণ একটাই, তোমার ভেতরে যে সত্তা, সেই একই সত্তা তার ভেতরেও আছে যার প্রাণ হরণ করে তুমি তোমার উদরকে পূর্ণ করছ। এই ভাবটাকে আমাদের জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে অনুশীলন করে যাওয়ার কথাই এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে।

আগেকার দিনে আমাদের পরম্পরাতে যে মিঠাইগুলো বানান হতো এইটাকে মাথায় রেখেই করা হত যাতে মিষ্টি গুলো কিছুদিন রেখে ব্যবহার করা যায়। একদিন দুদিনেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমন ধরণের কোন মিষ্টি বানান হতো না। আগেকার দিনে তাই খাজা, লাড্ডু, প্যাড়াই বানানো হতো আর এখন চলছে রসগোল্লা, পান্তুয়া, একদিন রাখার পরেই টকে যাচ্ছে। আগেকার দিনে রসের মিষ্টি বলতে একমাত্র ছিল মালপোয়া, সেটাও এমন ভাবে তৈরী করা হত যে, দুই তিন দিন রাখা যেত। ভারতের মিষ্টির কারিগররা খুব নামকরা, তাই বলে কি তখনকার দিনে কারিগররা যারা দিনরাত মিষ্টি তৈরী করে চলেছে, চাইলে রসগোল্লা আর লেডিকিনি বানাতে পারতেন না! এইভাবেই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, তুমি রাজা হও আর কাঙাল হও খাদ্যের অপচয় করার অনুমতি কখনই দেওয়া হবে না। কোন খাবার দাবার নষ্ট করা আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ করছে। এই কারণেই আমাদের শাস্ত্র নিষেধ করছে যে, তুমি প্রকৃতি থেকে তোমার খাদ্যকে টেনে নিচ্ছে, তার প্রাণ নিয়ে নিচ্ছ, তাই ঠিক ততটুকুই নেবে যতটুকু তুমি শরীর ধারণের জন্য গ্রহণ করতে পারবে। অনেকে যে বলেন বৌদ্ধধর্ম থেকে অহিংসা ভাব ভারতে এসেছে, আসলে এনারা আমাদের শাস্ত্রের এই জিনিষগুলো কখনই জানতেন না। আলবিরুনি যখন ভারতে এসেছিলেন, তিনিও তখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে, হিন্দুরা নিজেদেরকে খুব নাক উঁচু মনে করে, হিন্দুরা মনে করে তাদের মত ধর্ম কারুর নেই, তাদের মত সাহিত্য কারুর নেই, তাদের মত ভাষা কারুর নেই ইত্যাদি। যখনই এই জিনিষগুলো কেউ পড়বে তখন মনে হবে নাক উঁচু হবারই কথা। ঠিক ঠিক যারা বিদগ্ধ, যারাই হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থ গুলো পড়ে হিন্দু সংস্কৃতির ভেতরে ঢুকেছে তাদের কাছে বাকিদের সব কিছু এত নিম্নমানের মনে হয় যে এদের ধারে কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। খ্রীশ্চানরা প্রথমের দিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কারণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানা বসিয়ে খ্রীশ্চানদের সব বইগুলো ছাপিয়ে দিল, সবাই তখন তাদের বইগুলো পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল। অন্য দিকে হিন্দুদের সব বই পুঁথি আকারেই ছিল, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছাড়া হিন্দুদের ঐশ্বর্যের কোন খবর কেউ জানতই না। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন একটা একটা করে বই ছাপা হয়ে বেরোতে শুরু করল তখন সবাই চমকে উঠেছে, এদের সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম, ভাবনা চিন্তার গভীরতার ধারে কাছে কেউ দাঁড়াতেই পারবে না, হিন্দুধর্মের চিন্তাভাবনার গভীরতার কাছে বাকি সবাই সত্যিই শিশু।

সাত নম্বর মন্ত্রে ছয় নম্বর মন্ত্রের কথাটাই ঘুরিয়ে বলছেন –

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।৭

যস্মিন্, যে অবস্থায় *সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ*, স্থাবর, জঙ্গম, জীব যা কিছু আছে, সব কিছুতেই আত্মস্বরূপের দর্শন করেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই, এইরূপ দর্শনের ফলে তখন সব কিছু আত্মাই হয়ে যায়। এটা বলা হচ্ছে না যে দুম্ করে একদিনেই এই অনভূতি হয়ে যাবে, নিরন্তর সাধনা করেই যেতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবন চব্বিশ ঘন্টার ব্যাপার। চব্বিশ ঘন্টা মন এদিকে না থাকলে কিছুই হবে না। দিনে দু তিন ঘন্টা জপ করে ভাবলাম এবার কিছু নিশ্চয়ই হবে, কিছুই হবে না। তবে আজেবাজে দিকে মন দেওয়ার বদলে ঐ কয়েক ঘন্টা জপ-ধ্যান করা অনেক ভালো। কিছু না করার থেকে দিনে দুবার একশ আট বার জপ করা অনেক ভালো, তা নাহলে তো আরও গোল্লায় যেত। কিন্তু যদি কেউ মনে করে আমি আত্মতত্ত্বকে জানতে চাই, শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বকে জানতে চাই, তাহলে তাকে চব্বিশ ঘন্টা লেগে থাকতে হবে। আমাদের প্রেসিডেন্ট মহারাজ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহারাজদের আমরা সিদ্ধ পুরুষ বলেই মনে করি, তাঁদেরকে আমরা ঠাকুরের স্থানেই বসাই। তাহলে সিদ্ধ পুরুষের কাছ থেকে সিদ্ধ মন্ত্র লাভ করে আমরা বেশির ভাগ অসিদ্ধ হয়ে আছি কেন? কারণ আমাদের এই প্রচেষ্টাটা নেই, আবার অনেকেই দু ঘন্টা তিন ঘন্টা জপ-ধ্যান করে, তাদেরও হচ্ছে না কেন, কারণ চব্বিশ ঘন্টা লেগে থাকার সাধনাটা করা হচ্ছে না। প্রথমে খুব খেটে পরিশ্রম করে একটা স্থিতিতে নিয়ে যেতে হয়। ঐ স্থিতিতে নিয়ে যাওয়ার পরে একটা ভাবকে পাকা করতে হয়। ভাব হচ্ছে এইটাই, আমার ভেতরে যিনি তার ভেতরেও তিনি, যা কিছু আছে সব শ্রীরামকৃষ্ণ। নিরন্তর এই ভাবকে আশ্রয় করে থাকতে থাকতে তখনই দেখে *আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ*, আমিই এই সব কিছু হয়েছি, আমার থেকেই সব কিছু হয়েছে। সত্যি সত্যিই তাই হয়, আক্ষরিক অর্থেই হয়।

তারপর কি বলছেন? *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক*, যার একাত্ম ভাব হয়ে গেল, আমিও যা তুমিও তাই, সত্যিকারের এই ভাব এসে গেলে এখন কোথা থেকে তার শোক আসবে আর কোথা থেকে মোহ আসবে? যদিও এটা প্রশ্ন বাচক কিন্তু এটা হচ্ছে আক্ষেপ। যেমন প্রথম মন্ত্রে প্রশ্ন বাচক রূপে বলেছিলেন *কস্য স্বিদ্ধনম্*, এই ধন, সম্পদ, টাকা পয়সা কার? আসলে বলতে চাইছেন এগুলো কারুরই না। ঠিক তেমনি এখানেও বলছেন *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক*, তখন কার মোহ হয় আর কারই বা শোক হবে? কারুরই না। কারুর নয় এটা এর মধ্যেই প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে। যখন তুমি ঐ অবস্থায় গিয়ে সবটাই এক দেখছ তখন তুমি কাকে নিয়ে শোক করবে আর কিসের জন্যই বা মোহ করবে? ঐ অবস্থায় তুমি কোন শোক আর মোহ করবে না। যখন তার প্রিয়জন মারা গেছে তখন সে দেখছে আত্মার তো মৃত্যু হয় না, তাই তার শোক হবে না। তোমার টাকা-পয়সা চলে গেছে, কোথায় গেছে? তোমার কাছে থেকে আরেকজনের কাছে গেছে, সেওতো আমিই।

ঠাকুর যখন দুরারোগ্য রোগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কষ্ট পাচ্ছেন তখন একজন ভক্ত ঠাকুরকে বলছেন – আপনি একবার মাকে বলুন না যাতে আপনার শরীরটা ভালো করে দেন। মার কাছে এই শরীরের ব্যাধির কথা বলতে ঠাকুরের খুব লজ্জা করছে। তিনি তখন মার কাছে অনেক করে বলছেন – মা গলায় কি একটা হয়েছে যার জন্য খেতে পারছি না। তখন মা ঠাকুরের পার্ষদদের দেখিয়ে দিলেন – এদের সবার মুখ দিয়েতো তুই খাচ্ছিস। *কো মোহঃ*, মোহ মানে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মোহ, মা দেখিয়ে দিলেন এদের মুখ দিয়ে তো তুমিই খাচ্ছ। ঠাকুরের আর কিছু করার নেই। এই হচ্ছে উপনিষদের মন্ত্রের মুর্ত রূপ। সাত নম্বর মন্ত্রের অনুবাদ ঠাকুরের মধ্য দিয়ে হয়ে গেল, তুমি যে এত মুখে খাচ্ছ। *তত্র কো মোহঃ*, আমি খেতে পারছি না, এটা হল মোহ, অবতারের তো মোহ হতে পারেনা। আর *কঃ শোক*, কোন কিছু চলে গেলে শোক হবে না। এই মন্ত্রে অত্যন্ত উচ্চ অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে। যুক্তি দিয়ে এই অবস্থার বিশ্লেষণ করা যায় না, সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা। পওহারী বাবার জীবনের দুটো ঘটনাতেও এই মন্ত্রের অনুবাদ দেখতে পাওয়া যায়। পওহারী বাবার কুঠিয়ায় চোর চুরি করতে এসেছে, পওহারী বাবা জেগে যেতেই চোর ছুটে পালিয়েছে, পওহারী বাবাও কম্বল লোটা নিয়ে চোরের পেছনে ছুটে চলেছেন। ছুটে গিয়ে তিনি চোরকে ধরলেন, ধরেই চোরের হাতে কম্বল লোটা দিয়ে বলছেন প্রভু আপনি এগুলো নিতে ভুলে গেছেন। স্বামীজী পরে এক জায়গায় বলছেন, উত্তরাখণ্ডে এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে স্বামীজীকে বলছেন – আপনি পওহারী বাবার কথা শুনেছেন? এই ঘটনা বলে বলছেন – আমিই সেই চোর। পওহারী বাবার ঐ ঘটনাতে তাঁর মন পরিবর্তন হয়ে গিয়ে তিনি সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, একটা কুকুর ঘরে ঢুকে রুটি নিয়ে যাচ্ছে, পওহারী বাবা ঘিয়ের বাটি নিয়ে কুকুরের পেছনে ছুটেছেন, প্রভু রুটিতে ঘি লাগিয়ে নিতে দাও। সাপ এসেছে, তিনি তখন বলছেন

আমার প্রেমিকের থেকে দূত এসেছে। এগুলো অত্যন্ত উচ্চ অবস্থার কথা। সাপটা যদি ছোবল মারে তাতেও তাঁর মনে কোন বিকার হবে না। শেষ কালে যখন দেহত্যাগ করলেন, তিনি ঘরের আগল তুলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন। অনেক দিন কোন খবর নেই দেখে লোকেরা দরজা ভেঙ্গে দেখে শুধু ছাই পড়ে আছে, দেহটাকেই ত্যাগ করে দিয়েছেন, অথচ তিনি একজন উচ্চকোটির সাধু। এই মন্ত্রগুলো কোন তত্ত্ব বা তথ্য নয়, ঋষিরা অনুভূতি থেকে যেটা দেখেছেন সেটাই বলে দিয়েছেন। যাঁরা সন্ন্যাসী, ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানের পথিক, তাঁরা এই রকমই দেখেন। ধ্যান ধারণা করতে করতে, মন পরিষ্কার হতে হতে তাঁদের অন্তর জগতটা অনেক বেশি সত্য হয়ে যায়, অন্তর জগতটাই বাস্তব হয়ে যায়, বাইরের জগতটার গুরুত্বই হারিয়ে যায়। সিনেমা হলে যখন একটা ভালো দৃশ্য চলতে থাকে তখন সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে আশেপাশের সব কিছু ম্লান হয়ে আসে, তখন আর কারুর দিকে দৃষ্টি নেই। যখন সিনেমা শুরু হয়নি, তখন সবাই কত হৈচৈ করবে, এ ওকে ডাকছে, কেউ বাদাম আনতে বলছে, অমুক এখনো আসেনি। যেমনি প্রজেক্টরটা অন্ হয়ে গেল সব চুপ হয়ে গেল, আর সবার দৃষ্টি পর্দার দিকে চলে গেল। এখন আস্তে আস্তে মনটা নিবিষ্ট হতে থাকল, এত নিবিষ্ট হতে থাকছে এরপর আশেপাশে কি হচ্ছে সেদিকে আর কোন হুঁশ নেই। এখানেও ঠিক এই জিনিষটাই হয়, এখানে যেটা পর্দার উপর সিনেমাতে হচ্ছে এনাদের বেলায় সেটা অন্তর জগতের ক্ষেত্রে হয়। অন্তর জগতের প্রজেক্টরটা যখন চলতে শুরু হয়ে যাবে তখন বাইরের জগতের আশেপাশের সব কিছুর তাৎপর্যটা হারিয়ে যেতে থাকে। তখন কে কার সাথে মারামারি করছে কে কার সাথে জড়াজড়ি করছে কোন হুঁশই থাকে না। সাধারণ জিনিষের প্রতি, কে এটা নিয়ে গেল, কে আমাকে কি দিল এগুলো তার মধ্যে কোন ঢেউ তুলতে পারেনা।

কিন্তু অন্য দিকে তাঁর মন আছে যে বলা হয়, যখন ভক্তি ভাবের কথা হয় তখন বলা হয়। এখানে কিন্তু তা বলা হচ্ছে না, এখানে ভাবনা চিন্তা নিয়ে বলা হচ্ছে। এমনটি তুমিও চিন্তা করলে পরে তুমিও দেখবে জিনিষটা এই রকম। গীতাতে অর্জুনকে উপলক্ষ করে সমস্ত মানবজাতিকে শোক মোহের সমুদ্র থেকে বার করার কথা বলা হচ্ছে। ঈশাবাস্যোপনিষদে এই মন্ত্রে আত্মজ্ঞানের ফলের কথা বলা হচ্ছে। আত্মজ্ঞানের ফল কি হয়? সাংসারিক শোক মোহের জন্মদাত্রী হচ্ছে অবিদ্যা। আমরা অজ্ঞানে পড়ে আছি বলেই আমাদের শোক আর মোহ। আত্মতত্ত্ব ঐ অবিদ্যাটাকে পুড়িয়ে দেয়। অবিদ্যাকে পুড়িয়ে দেয় বলে শোক মোহটাও চলে যায়। এখানে বলা হচ্ছে আত্মবিৎ যখন সবাইকে আত্মাই দেখেন তখন তিনি কাকে নিয়ে শোক করবেন আর কি নিয়ে মোহ করবেন। আসলে শোক আর মোহ অজ্ঞান থেকে আসছে, নিজেকে যখন দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে দিয়ে সীমিত করে দিচ্ছে। আত্মতত্ত্ব এই অজ্ঞানকেই আগুন লাগিয়ে দেয়, অজ্ঞানই এখন ছাই হয়ে গেল, সাথে সাথে শোক মোহটাও ছাই হয়ে গেল। এখানে আত্মতত্ত্বের যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন। আমি একদিক থেকে এটাকে উপপত্তি বলতে পারি। কিন্তু উপপত্তি হচ্ছে অবিদ্যা, এখানে অবিদ্যাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না, আত্মতত্ত্বকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। সেইজন্য এই মন্ত্রটা হল ঠিক ঠিক ফল। যিনি আত্মতত্ত্ব জেনে গেলেন তাঁর দৃষ্ট ফল হচ্ছে সংসারের শোক মোহের নাশ আর এর অদৃষ্ট ফল হচ্ছে মুক্তি, অবিদ্যার নাশ। তোমরা যে বলছ বেদ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল দেয়, আমি যত কাজই করিনা কেন আমাকে দৃষ্ট ফলই দেবে, আমি যদি অফিসে চাকরি করে থাকি তার জন্য আমি মাইনে পাচ্ছি। কিন্তু যজ্ঞের ক্ষেত্রে বলবে, যজ্ঞ করলে তুমি দৃষ্ট ফলও পাবে আবার অদৃষ্ট ফলও পাবে, সেইজন্যই যজ্ঞের এত প্রাধান্য। এবার আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য বলছেন, আত্মজ্ঞানের সাধনা যদি তুমি কর তাহলে তুমি দৃষ্ট ফলও পাবে আর অদৃষ্ট ফলও পাবে, দৃষ্ট ফল হচ্ছে শোক মোহের নাশ, তোমার আর চোখের জল বেরোবে না। আর অদৃষ্ট ফল হল অজ্ঞান নিবৃত্তি। অদৃষ্ট ফল মানে যেটা চোখে দেখা যায় না। তা তুমি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে কিনা সেটা কে দেখেছে, সেটাও তো অদৃষ্ট, কিন্তু বেদে বলছে বলে এটাকে সবাই মেনে নিচ্ছে। এটাও ঠিক তাই, শাস্ত্রে বলছে, *ন স ভূয়োহভিজায়তে,* আর তাকে জন্ম নিতে হবে না, সেটাই মুক্তি। এখন যদি বলা হয়, তোমাকে আমি এক কোটি টাকা দেব আর তার বদলে তোমাকে সারা জীবন চোখের জল ফেলতে হবে, তুমি কি সেই টাকা নেবে?

একটা খুব নামকরা জার্মান নাটক আছে, তাতে বলছে, এই জিনিষটা করলে তোমার তিনটে ইচ্ছা পূর্ণ হবে। সেই মত সে করে বলল, যে কথা বলা হল এটা যদি সত্য হয় তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে যেন আমি এক লাখ টাকা পেয়ে যাই, দেখি তো কেমন সত্য হয়। ওরা যেখনে থাকত সেটা ছিল একটা কারখানার নগরী, ওর ছেলে ওখানকার কারখানাতে কাজ করত। যেই এই কথা বলেছে তার কিছুক্ষণ পরেই কারখানার বড় সাইরেন অসময়ে বাজতে শুরু করেছে। তার একটু পরেই কারখানার একজন বড় সাহেব তাদের বাড়িতে পৌঁছে গেছে। বড় সাহেব তাদের বলছে, কারখানায় একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, আপনাদের ছেলে এই ঘটনাতে মারা গেছে। এমন ভাবে পিষে গেছে যে তার বডি আপনাদের দেখানো

যাবে না বলে তাকে কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানী আপনাদের এই এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ মঞ্জুর করেছে। বাবা-মা তো খুব কান্নাকাটি করছে, এই টাকা নিয়ে আমরা এখন কি করব, আমাদের একমাত্র সম্বল সেই চলে গেল। সকাল বেলায় মা কাঁদছে, এই টাকা আমি চাইনা, এই টাকা ফেলে দাও, পুড়িয়ে দাও, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই সময় একটা দমকা বাতাস এসে যে এক লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়েছিল সেই চেকটা উড়ে গিয়ে আগুনের মধ্যে পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেই মুহুর্তে একটা বিরাট ভূমিকম্প হতে লাগল সাথে সাথে ঝড় বৃষ্টি চলছে। তার মধ্যে ছেলের মৃতদেহ যেটা একেবারে বিকৃত হয়ে গিয়েছে, তারমধ্যে আবার এতক্ষণ কবরেরে মধ্যে থেকে সারা শরীরে পোকা ধরে নিয়েছে। ঐ রকম এক বিকট চেহারার ভয়ঙ্কর শরীর দেখে তখন আবার তারা আঁতকে উঠে বলছে – না বাবা, আমাদের কিছু লাগবে না, তুমি কবরেই ফেরত চলে যাও। তারপর আবার ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে সব কিছু স্বাভাবিক অবস্থাতে ফিরে এল। মাঝখান থেকে ওদের ছেলেটাই চলে গেল। এটা একটা রূপক আকারের কাহিনী। মূল কথা হচ্ছে, যদি আমাকে বলা হয় তোমাকে এক কোটি টাকা দেওয়া হবে কিন্তু তার জন্য তোমার রাত্রে ঘুম হবে না, খাওয়া হজম হবে না আর বসে বসে খালি কাঁদতেই হবে। কেউ কি এতে রাজী হবে? ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়রাম মল্লিক মশাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়েছে। মল্লিক মশাই বলছেনে তুমি কানা নয়, খোঁড়া নয় তোমাকে কেন টাকা দিতে যাব। হৃদয়রাম বলছেন, রাখুন আপনার টাকা, আপনার টাকার জন্য আমার কানা খোঁড়া হয়ে কাজ নেই।

এইটাই বলছেন, তোমার দৃষ্ট ফলে কি আর দেবে, তোমার যজ্ঞ করে কটা টাকা দেবে, একটা সন্তান দিতে পারবে। কিন্তু আত্মতত্ত্বের দৃষ্ট ফল কি দেবে? শোক মোহের নাশ করে দেবে। তোমার অদৃষ্ট ফল স্বর্গ, স্বর্গ থেকে তোমার আবার পতন হবে, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ফল মুক্তি, আসা-যাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল, সব দিক থেকেই তোমার থেকে আমার দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল শ্রেষ্ঠ। এতক্ষণ আত্মতত্ত্বের দুটো জিনিষ বলা হল, উপপত্তি আর ফলের কথা বলা হল। এবার বলা হবে আত্মার স্বরূপ। বেদের যে ষড়লিঙ্গ নিয়মের মধ্যে এটা পড়ছে না। সেইজন্য যেহেতু বেদের কোন নিয়মের মধ্যে পড়ে না, আচার্য তাই এখন পুরোদমে নেমে পড়েছেন।

১২/১২/১০

এই যে এতক্ষণ আত্মাতত্ত্বের কথা বলা হল, অষ্টম মন্ত্রে এবার সেই আত্মার স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এই মন্ত্রটা সবারই মুখস্ত করে রাখা ভাল, পুরো উপনিষদ মুখস্ত করা যদিও সম্ভব না হয় তবুও কিছু কিছু মন্ত্র মুখস্ত করে রাখা ভাল। স্বামীজীও তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে বলেছিলেন কঠোপনিষদ মুখস্ত করতে। অষ্টম মন্ত্রে আত্মার স্বরূপের বর্ণনা করা হচ্ছে, এই বর্ণনাগুলিকেই আমরা পরে গীতাতে ব্যাখ্যা রূপে পাই। আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন –

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমাপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।৮

সোপাধিক ঈশ্বরের বা নিজের ইষ্টের গুণের যেমনটি বর্ণনা দেওয়া হয়, তিনি দয়াময়, তিনি কৃপাময়, তিনি সর্বশক্তিমান ইত্যাদি, এগুলো সগুণ ঈশ্বরের যে ধারণা করা হয় তার অভিব্যক্তি। কিন্তু এখানে তা করা হচ্ছে না, আত্মার নিরুপাধিক বা সোপাধিক স্বরূপ কেমন সেটাও বলা হচ্ছে না। আত্মা যেমনটি ঠিক তেমনটি বর্ণনা করা হচ্ছে। কি রকম বলছেন –

স পর্যগাৎ (পরি অগাৎ) *অগাৎ* মানে যাওয়া, পরি অগাৎ মানে সব দিকে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, কোন একটা জায়গাতেই তিনি নেই, আমি যে বলব তিনি শুধু আমার হৃদয় জুড়েই আছেন তা নয়, চারিদিকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জুড়ে সর্বত্র তিনি ব্যপৃত হয়ে আছেন, তিনি অনন্ত। তিনি আকাশের মত, আকাশ যেমন সর্বব্যাপী, আত্মাও ঠিক তেমনি সর্বব্যাপী। অন্যান্য ভাষ্যকাররা এখানে কায়দা করে একটু অন্য রকম ভাবে ব্যাখ্যা করেন। এখানে যে 'স' বলছে, এই 'স' মানে

আত্মা নয়, 'স' মানে ঈশ্বর। আমাদের কাছে আচার্য শঙ্করই অনুসরণীয়, তাই তিনি যেটা বলেছেন সেটাকেই বেদবাক্য ধরে নিয়ে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স পর্যগাৎ আত্মা সর্বব্যাপী, 'স' এর অর্থ পাল্টালেও এই 'পর্যগাৎ' শব্দের কোন অন্য অর্থ করা যাবে না, *পর্যগাৎ* মানে সব দিকে তিনি ছড়িয়ে আছেন। বলার পর আত্মার ব্যাপারে বলছেন আত্মা *শুক্রম্*, আত্মা *শুদ্ধম্*, শুধু শুদ্ধই নয়, আচার্য শুক্রম্ শব্দের অর্থ করছেন, তিনি *জ্যোতিষ্মাৎ দীপ্তিমান ইতি অর্থ*, অর্থাৎ আত্মা একেবারে যেন বিশুদ্ধ জ্যোতি। মণির আলো, স্ফটিকের আলো যেমন শুদ্ধ জ্যোতি। শুদ্ধ জ্যোতি বলতে তাঁর যে কোন রঙ আছে, সেই জ্যোতির কোন তরঙ্গ আছে, তাঁর আলোর যে কোন ধরণের তারতম্য হবে, এসব কিছুই নেই, শুধু মাত্র বিশুদ্ধ শুভ্র জ্যোতিই। আসলে শুদ্ধ জ্যোতির দ্বারা এখানে অন্ধকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। বিভিন্ন উপনিষদে এই জ্যোতির বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। গীতাতে এই ধরণের জ্যোতির বর্ণনা খুব সামান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সাধন ভজন করেন এবং ধ্যানের গভীরে গিয়ে তাঁরা যখন ইষ্টকে আত্মা রূপে দর্শন করেন বা যেটাই দর্শন করেন তাঁরা প্রথমে জ্যোতির মতই দর্শন করেন। ঠাকুর আবার বর্ণনা করছেন এই জ্যোতির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের রঙ আসে। এই জ্যোতি আবার কি রকম? সূর্যের জ্যোতিও শুদ্ধ জ্যোতি কিন্তু সূর্যের জ্যোতির দিকে তাকান যায় না, চোখ ঝলসে যায়, কিন্তু এই জ্যোতির আলোতে চোখ ঝলসে যায় না, খুব স্নিগ্ধ। ইসলাম ধর্মের পরম্পরাতে যাঁরা সাধনা করেছেন তাঁরাও জ্যোতির ঠিক এই রকম বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

আত্মা *অকায়ম্*, অকায়মের অর্থ হচ্ছে শরীর বর্জিত, কায় হীন, কায়া বলে আত্মার কিছু হয় না। আচার্য অকায়মের অর্থ করতে গিয়ে বলছেন, কোন ধরণের লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীরের অভাব। কিন্তু যারা বেদান্তের মতকে মানে না, তারা এই *অকায়মের* অর্থ করে দেবে আত্মার কোন স্থূল শরীর নেই কিন্তু লিঙ্গ শরীর আছে। এখানে আমরা তাহলে কার অর্থটাকে গ্রহণ করবো? আচার্য তাঁর ভাষ্যকে যে ভাবে দাঁড় করিয়েছেন সেখানে অর্থ নিরুপণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের অসামঞ্জস্য পাওয়া যাবে না, তিনি ষড়লিঙ্গের অর্থাৎ ছটি নিয়মের মধ্যে এই উপনিষদের অর্থকে বেঁধে রেখেছেন। তাই তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম কথা বলে গেছেন। উপনিষদের যে মূল ভাব, সেটাকে ধরে রেখে সব কিছুর অর্থ করে ঘুরিয়ে ঠিক ঐ মূল ভাবে নিয়ে মিলিয়ে দিচ্ছেন। এখানে যদি দুম্ করে অর্থ করা হয় যে, ভগবানের স্থূল শরীর নেই কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর আছে তাহলে সব হিসেবে গরমিল হয়ে যাবে। পুরো উপনিষদের কোথাও কি এই ধরণের কোন কথা বলা হয়েছে যে আত্মার লিঙ্গ শরীর আছে? বলা হয়নি। আমরা যতই বর্ণপ্রথা, জাতিপ্রথাকে গালাগালি দিইনা কেন, তখনকার দিনে এই কারণেই সবাইকে এই জিনিষগুলি পড়ার অধিকার দেওয়া হতো না। কারণ উপনিষদের মন্ত্রগুলিতে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সম্ভবনা আছে। যারা নিজে থেকে একটু পাণ্ডিত্য অর্জন করে উপনিষদের অর্থের ব্যাখ্যা করতে যেত তাদেরকে এনারা কোন গুরুত্বই দিতেন না। যার ঠিক ঠিক প্রশিক্ষণ নেই সে নিজের মত ব্যাখ্যা করে নিজের মত দর্শন তৈরী করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে উপনিষদের দফারফা করে ছেড়ে দেবে। সেইজন্য আগে থেকেই মুনি ঋষিরা ঠিক করে দিয়েছিলেন যে, উপনিষদ পরম্পরা ছাড়া কখনই অধ্যয়ণ করান হবে না। যারাই উপনিষদ ব্যাখ্যা করতে আসবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করত, আপনি এটা কার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলে, তিনি আবার কার কাছে অধ্যয়ণ করেছিলেন এইভাবে শেষে বশিষ্ট, ব্যাসদেব পর্যন্ত যেতে হবে। এইভাবে যদি না গিয়ে থাকে তাহলে তার ব্যাখ্যা কোন ভাবেই মানা যাবে না। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভাষ্য দেওয়ার সময় আচার্য বলছেন, যাদের কোন সম্প্রদায় নেই, যে সম্প্রদায়হীন বিদ্যা পেয়েছে, তারা যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন তাদের কথা নেওয়া চলবে না। এই কারণেই এই নিয়ম করা হয়েছে, তা নাহলে এগুলো খুব বিপজ্জনক হয়ে যায়। উপনিষদের কথার উপর কারুর কথা চলবে না, ভারতীয় দর্শনে উপনিষদই শেষ কথা।

আত্মার আরেকট বৈশিষ্ট্য, *অব্রণম্*। ব্রণ মানে ঘা, *অব্রণ* মানে অক্ষত, কোন ক্ষত নেই। এখন যার শরীরই নেই তার আবার ক্ষত কোথা থেকে হবে। গীতাতে ভগবান বলছেন – *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*, এইটাই ঠিক ঠিক অক্ষতের অনুবাদ, যাঁর কোন ক্ষতই হয় না, তিনি নিহত হবেন কি করে। গীতার এই শ্লোকটাই আবার কঠোপনিষদে মন্ত্র হিসাবে আসছে। আকাশকে যেমন খণ্ডিত করা যায় না, ঠিক তেমনি আত্মাকে কোন রকমের বিভাজন করা যায় না। আত্মার স্বরূপকে যদি বুঝতে হয় তাহলে এর কাছাকাছি হবে আকাশ। আকাশ যেমন সর্বব্যাপী আবার অনু রূপে সব কিছুর মধ্যেই আছে, যেমন এই গ্লাশের মধ্যেও আকাশ আছে গ্লাশের বাইরেও আকাশ। আত্মাও ঠিক তাই, তিনি সর্বব্যাপি আবার ভেতরেও আছেন। আত্মার ভৌতিক শরীরটা কি রকম এবং আত্মতত্ত্বকে বোঝার জন্য আকাশ হল সবচেয়ে ভালো উপমা।

অস্নাবিরং, স্নাবিরং মানে স্নায়ু। আমাদের শরীরে কত রকমের নাড়ি, শিরা রয়েছে কিন্তু আত্মার এসব কিছুই নেই। একজন সাধারণ অজ্ঞ যুবক ঋষির কাছে এসে বলছে আমাকে উপনিষদের শিক্ষা দিন। অল্প বয়স, কিছুই জানেনা, দেহবোধ ছাড়া তার আর কিছু নেই। ঋষি তখন এইভাবে দু তিনটে শব্দ দিয়ে তার দেহবোধটাকে কাটাচ্ছেন। এখানে প্রত্যেকটা শব্দই 'অ' দিয়ে বলা হচ্ছে – *অকায়ম্, অব্রণম্, অস্নাবিরং*। এটাই হচ্ছে উপনিষদের নামকরা নেতি নেতি পদ্ধতি, এটা নয়, এটা নয় বলে বলে আত্মার বর্ণনা করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে ইতি ইতিটাও বলছেন, মাঝে মাঝে স্বরূপটাও বলছেন, কিন্তু সেই স্বরূপটাও পরস্পর বিরোধী শব্দ এনে বলবেন, তুমি যেটা ভাবছ আত্মা তা নন। যেমন এক জাগায় বলছেন জ্যোতির জ্যোতি, একদিকে এখানে বলা হল শুক্রম্ আবার বলছেন জ্যোতির জ্যোতি, এই ধরণের কথাগুলো বলা হয় শুধু আত্মাকে বোঝানোর জন্য। বুদ্ধি দিয়ে এই আত্মতত্ত্বের কোন কিছুই ধারণা করা যায় না। আর সাধারণ মানুষ একটা জিনিষকে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যা ধারণা করে, সেই ধারণাটাকে পুরো কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর শরীর নেই, তাঁর স্নায়ু নেই, শরীর নেই তার মানে তাঁর কোন ক্ষত হবে না।

অব্রণ ও *অস্নাবিরং* এই দুটি শব্দকে এনে আত্মার স্থুল শরীরকে প্রতিষেদ করা হল, ভগবানের স্থুল শরীর নেই। অন্যান্য ধর্মে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা তাতে কিন্তু অনেক ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয়। ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা করলেই তাঁর শরীরের কথা এসে যায়, ভগবানে স্থুল শরীরের কথা এলেই তার স্নায়ুর কথা এসে যায়, তাঁর পেশীর কথা এসে যায়। এই দুটো শব্দে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর কোন শরীর নেই। *অকায়ম্* শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকে বাদ দেওয়া হল আর *শুক্রম্* বলাতে তাঁর কারণ শরীরটাকেও বাদ দিয়ে দেওয়া হল। বলা হয় একটা শরীরের পেছনে আরেকটা শরীর থাকে, স্থুল শরীরের পেছনে সূক্ষ্ম শরীর থাকে, আর সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে থাকে কারণ শরীর। এখানে সব কটা শরীরকে প্রতিষেদ করে দিয়ে বলে দেওয়া হল শুদ্ধম্, আত্মা একেবারে শুদ্ধম্, কিছুই নেই সেখানে। শুদ্ধম্ মানে *কারণশরীর বর্জিতম্*।

অপাপ অবিদ্ধম্, আত্মার ক্ষেত্রে ধর্ম ও অধর্ম দুটোই পাপ। বেদান্ত যে কোন ধর্ম থেকে এই জায়গাতে এসে আলাদা হয়ে যায়। এখানে বেদান্ত বলতে হিন্দুধর্মকে বোঝান হচ্ছে না। স্বামীজী বলছেন বেদান্ত সব কিছুকে নিয়েই চলে। এই বেদান্তকেই যখন ভারতীয় সংস্কৃতির ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয় তখন এর নাম হয়ে যাচ্ছে হিন্দুধর্ম, এটা কিন্তু বিশুদ্ধ বেদান্ত নয়। বেদান্তের দ্বৈতবাদকে যখন ইউরোপের ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয় তখন এটাই খ্রীষ্ট ধর্ম হয়ে যায়, আবার এরই দ্বৈতবাদকে সেমেটিক ধর্মের জুহুদি গোষ্টিদের দিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটাই ইসলাম ধর্ম হয়ে যায়। আর অদ্বৈতকে যখন যোগমার্গে দেখা হয় তখন সেটা বৌদ্ধধর্ম হয়ে যায়। সবটাই বেদান্ত। অন্যান যে কোন ধর্মে বিশেষ করে যে ধর্মে স্বর্গে যাওয়াটা জীবনের উদ্দেশ্য, সেই সব ধর্মে অধর্ম, পাপ অতি গর্হিত। একমাত্র বেদান্তেই ধর্মটাও বন্ধন। বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মের সাথে প্রধান পার্থক্য এইখানেই, অন্যান্য ধর্মে ভালোটা ভালো কিন্তু বেদান্তে ভালোটাও বন্ধন। এই যে শুদ্ধ ব্রহ্ম, শুদ্ধ আত্মা এটা হচ্ছে *অপাপবিদ্ধম্*, এখানে পাপ বলতে ধর্মকেও পাপ বলা হয়। আত্মার জন্য ধর্মটাও বন্ধন। ধর্মটা হচ্ছে সব সময় সত্ত্বগুণের লক্ষণ, সত্ত্বগুণও বেঁধে ফেলে। কিভাবে সত্ত্বগুণ বাঁধে? গীতাতে বলছে – *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, সত্ত্বগুণের প্রভাব যখন বাড়তে তখন সে মানুষকে সুখ দিয়ে আর জ্ঞান দিয়ে বাঁধে। মানুষ যখন ধর্ম করে তখন তার একটা সুখ অনুভব হয় আর একটা জ্ঞান বিশেষেই তার ধর্ম কার্যে প্রবৃত্তি হয়। তাই সুখ, জ্ঞান, সত্ত্বগুণ আর ধর্ম পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। তাই সত্ত্বগুণটাও বন্ধন। সেইজন্য বেদান্তে বলা হয় তোমাকে সত্ত্বগুণেরও পারে যেতে হবে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে সত্ত্বগুণটাই হচ্ছে শেষ অবস্থা। তাই এখানে *অপাপবিদ্ধম্* এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে *ধর্মাধর্মাদি পাপ বর্জিতম্*, ধর্মটাও পাপ। সাধারণ মানুষের পক্ষে ধর্মটাও পাপ এই জিনিষটাকে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিণ হয়ে যায়। যারা সাত্ত্বিকগুণে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন একমাত্র তাঁরাই এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। যতক্ষণ শুদ্ধসত্ত্ব না হচ্ছে ততক্ষণ এই কথাগুলো আলোচনা করা যায় না, তবে শুনে রাখতে হয়। এই কথা গুলো যাঁরা পড়াচ্ছেন তাঁরা ঋষি, তাঁরা নিজেদের শিষ্যদের বলছেন, যারা পঁচিশ বছর তিরিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে নিজের গুরুর কাছে পড়ে আছেন। এই শিষ্যরা এখন যে কোন তত্ত্বকে ধারণা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। যেহেতু এখানে ধর্মটাকেও পাপ বলা হচ্ছে সেইহেতু আমরা যদি বলি আমরাও ধর্ম পালন করবো না, তাহলেই কিন্তু আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। যাঁরা একেবারে শুদ্ধ সাত্ত্বিক গুণে প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা একমাত্র আত্মজ্ঞান পেতে চাইছেন, এটা শুধু তাঁদের জন্যই বলা হচ্ছে, ধর্মটাও পাপ, অন্যদের জন্য এটা নয়। অন্যদের জন্য হচ্ছে যার যা ধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীশ্চান ধর্ম এইগুলো, যেখানে ধর্মই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য, তার মানে সত্ত্বগুণী হওয়া হচ্ছে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের যে চারটে বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সেখানে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্ত্বগুণী হওয়া, ব্রাহ্মণকে একেবারে শুদ্ধ সত্ত্বগুণী হতে হবে। অন্য দিকে সন্ন্যাসীকে বলা

হবে তুমি সত্ত্বগুণকেও পার করে তিনটে গুণের বাইরে চলে যাবে। কথামৃতে ঠাকুর এই জিনিষগুলিকে বার বার উত্থাপন করেছেন। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলো ঠিক ঠিক ধারণা করা কঠিণ।

এই হচ্ছে ঠিক ঠিক আত্মার স্বরূপ, *স পর্যগাৎ, শুক্রম্, অকায়ম্, অব্রণম্, অস্নাবিরং, শুদ্ধম্, অপাপবিদ্ধম্*। আত্মা শুদ্ধম্ কোন ধরণের অবিদ্যার স্থান নেই, একেবারে নির্মল।

এরপর বলছেন, *কবিঃ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ*, কবি হচ্ছে ক্রান্তদর্শী, ক্রান্ত মানে অতীত, যিনি অতীতকে পুরোপুরি জানেন তিনিই কবি বা ক্রান্তদর্শী। কিন্তু ভগবানকে কবি বলা হয় কারণ তিনি ত্রিকালদর্শী, ভূত, ভবিষ্যত আর বর্তমান এই তিনটে কালের সব কিছু তিনি জানেন। হিন্দু শাস্ত্রে কবি শব্দটা খুব উচ্চ ভাবব্যঞ্জক একটি শব্দ, কবি ভগবানকেই বলা হয়। সংস্কৃতে কবি শব্দের ব্যাখ্যা দাঁড়ায় যিনি ক্রান্তদর্শী, যিনি অতীতটা দেখতে পান। সাধারণ কবি যাঁরা তাঁরা হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী, শুধু পেছন দিকটা দেখতে পারেন। কিন্তু ভগবান তা নন, ভগবান হচ্ছেন ত্রিকালদর্শী, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান তিনটেই দেখতে পান। কিন্তু শব্দের সুবিধার্থে তাঁকে বলা হয় কবি, তাই কবি ভগবানের একটি নাম। এখন যারা কবিতা লেখেন তাদেরকেও কবি বলা হয়। এখানে *কবিঃ* শব্দকে সর্বদর্শী অর্থে বলা হচ্ছে, সবটাই তিনি জানেন, যেটা হবে সেটাও জানেন, যেটা হবে না সেটাও জানেন। এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে নিয়ে বলছেন – *ন অন্যো অতো অস্তি দ্রষ্টা*, আত্মা ছাড়া আর কেউ দ্রষ্টা নেই, একমাত্র তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই শুধু দেখেন। আর কেউ দ্রষ্টা না থাকার জন্য তিনি হয়ে গেলেন ত্রিকালদর্শী। এইজন্য ঠাকুর বলছেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই সব জানেন। আমি, আপনি সবাই কেঁদে মরছি কারণ আমরা শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে নিজের আমিত্বকে জুড়ে রেখেছি। কিন্তু এখানে যাবতীয় যা কথা বলা হচ্ছে সব আমারই কথা বলা হচ্ছে, আমিই ক্রান্তদর্শী, আমিই ত্রিকালদর্শী। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, বোঝা দূরে থাক আমাদের বিশ্বাসই হবে না যদি কেউ আমাকে বলে আপনি ত্রিকালদর্শী। আত্মার আলো যখন বেরোয় তখন সেই আলোর উপর এত আবরণ দেওয়া থাকে যে মনে হবে যেন কিছু একটা ক্ষীণ আলো বেরোচ্ছে। আবরণটা কি? অজ্ঞানের আবরণ, দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের আবরণ আর তার উপর চেপে আছে হাজার হাজার উপাধি। আত্মজ্ঞানীর ভেতর থেকে আত্মার সবটুকু আলোই বিকিরণ দিচ্ছে। আসল বোঝা হয়ে আছে সূক্ষ্ম শরীরে, স্থুল শরীর কোন বোঝাই নয়। ঘোড়ার চোখে যেমন ঠুলি দিয়ে রাখে, যার ফলে সে সামনের দিকে এতটুকু দেখতে পায়, ঠুলি খুলে দিলে চারিদিকের সব কিছুই দেখতে পাবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আত্মজ্ঞানের উপরে ঠুলি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে আত্মার ক্ষীণ একটু আলো বেরোতে থাকে।

কবির পর বলা হচ্ছে *মনীষী*, মনীষী হচ্ছেন যিনি মনের উপর শাসন করেন। আমরা হলাম মনের দ্বারা শাসিত, মন আমাদের রাজা আমরা প্রজা। কিন্তু আত্মজ্ঞানীর কাছে মন কখনই রাজা নয়, তিনিই মনের রাজা। আমরা সাধারণত যে অর্থে বিখ্যাত কাউকে সম্বোধন করে বলি তিনি একজন বড় মনীষী, এখানে মনীষীর অর্থ একটাই যিনি মনের শাসন করেন। মনের শাসন করতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া বা সর্বজ্ঞ ছাড়া মনের উপর শাসন কেউ করতে পারেনা, তিনিই হচ্ছেন সেই আত্মা। *পরিভূঃ*, পরি মানে উপরে, সবারই উপরে তিনি, তিনিই সর্বোত্তম, সেইজন্য তাঁর নাম পরিভূঃ, তিনি রাজার রাজা সম্রাট। *স্বয়ম্ভূঃ*, যিনি নিজে হয়েছেন। বাকি সব কিছুর স্রষ্টা আছে, আমার এই শরীরের একজন স্রষ্টা আছেন। এই স্থুল শরীরের পেছনে আছে সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে আছে কারণ শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে আবার তন্মাত্রাগুলো আসবে, তন্মাত্রার পেছনে অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি এগুলো থাকবে, এদের সবার পেছনে আসছে প্রকৃতি। প্রকৃতির জন্ম কে দিয়েছে? পুরুষ থেকে প্রকৃতি বেরিয়েছে। পুরুষের কে জন্ম দিয়েছে? যাজ্ঞবল্ককে গার্গীও এই প্রশ্ন করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক তখন গার্গীকে বলছেন, গার্গী তুমি না বুঝে আর প্রশ্ন করো না, তাহলে তোমার মুণ্ডু খসে যাবে। ইনি হচ্ছেন *স্বয়ম্ভূঃ*, নিজেই হয়েছেন। নিজে হয়েছেন বলতে কি এই বলছে যে, তিনি কোন এক সময়ে ছিলেন না, তারপর কোন এক সময়ে হয়েছেন? না, তা নয়। তিনিই আছেন। যদি তিনি হয়েও থাকেন আমাদের কোন উপায়ই নেই জানার, কারণ যে জিনিষ দিয়ে জানা হয়, সেই মন, বুদ্ধিতো অনেক পরে এসেছে। তিনিই ছিলেন, তিনিই আছেন আর তিনিই থাকবেন, এই রকম যদি না হয় তাহলে তিনি কখন আছেন, কখন নেই, কখন হবেন এই রকম হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা যদি হয়ে যায় তাহলে আত্মা বিনাশশীল হয়ে গেলেন। বিনাশশীল হয়ে গেল আত্মার যে স্বরূপের কথা বলা হল এগুলো আর থাকবে না। আত্মার স্বরূপের যে বর্ণনা করা হয়েছিল সেগুলোকে মেলাতে গেলে এইটাই দাঁড়াবে তিনিই তিন কালে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। *স্বয়ম্ভূঃ* না হলে বাকী যা বলা হয়েছিল সব অসঙ্গত হয়ে যাবে। স্থুল শরীর দিলে তাকে ভালো খাওয়া-

দাওয়া দিতে হবে, খাওয়া-দাওয়া দিলেই তার শরীর কখন ভালো থাকবে কখন খারাপ থাকবে। তখন তাহলে তিনি আর ভগবান থাকবেন না। সূক্ষ্ম শরীর হলেও সেই একই সমস্যা থেকে যাবে।

এই হল আত্মার স্বরূপ। আত্মা *স পর্যগাৎ, শুক্রম্, অকায়ম্, অব্রণম্, অস্নাবিরং, শুদ্ধম্, অপাপবিদ্ধম্, কবিঃ, মনীষী, পরিভূঃ ও স্বয়ম্ভূঃ*। এই কয়টি আত্মার স্বরূপ। এরপর বলছেন, এই ভগবানের যাঁর এই স্বরূপ তিনি করেন কি? এখানে মনে রাখতে হবে উপনিষদে একজন ঋষি আছেন, তিনি তাঁর শিষ্যকে আত্মজ্ঞান দিচ্ছেন। শিষ্যদের মনে হাজারটা প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রশ্ন আসছে, তিনি কি করেন? ঋষি তখন বলছেন – *যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ*। এখানে তিনি কে? *স নিত্যমুক্ত ঈশ্বরো,* এখানে যে আত্মার কথা বলা হচ্ছে, সেই আত্মাকে আচার্য বলছেন ঈশ্বর। আমাদের মনে একটা বদ্ধ ধারণা যে, অদ্বৈত বেদান্তে ব্যক্তি ঈশ্বর বলে কিছু নেই, অদ্বৈত ঈশ্বর মানে না। অদ্বৈত সব কিছুকেই গ্রহণ করে, কোনটাকেই বাদ দিয়ে ফেলে দেয় না। এইখানেই আমরা অনেকে ভুল করে থাকি, এই ভুলটা আরও বেশি করে হয় স্বামীজীর কিছু বক্তৃতাকে না বুঝে পড়ার জন্য। স্বামীজী তাঁর অনেক বক্তৃতাতে যে ঈশ্বরকে আক্রমণ করেছেন, সেখানে তিনি অদ্বৈতের ঈশ্বরকে আক্রমণ করে কিছু বলছেন না, তিনি যা বলেছেন তা খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মের আর হিন্দুদের দ্বৈতবাদীদের ঈশ্বরকে। এদের ধর্মের ঈশ্বর যিনি, তিনি স্বর্গে বসে আছেন, সেখানে বসে শাসন করছেন। ঠাকুর বলছেন তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়, অন্য দিকে খ্রীশ্চানরাও বলে তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়। এখন ঠাকুরের তাঁর ইচ্ছা আর খ্রীশ্চানদের তাঁর ইচ্ছা, এই দুটো কি একই কথা? এইখানেই অনেক ভুল করে ফেলেন। খ্রীশ্চানদের তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে, ভগবান একজন মেঘের ওপারে একটা সুপার কম্প্যুটার নিয়ে বসে সব কিছু চালাচ্ছেন, তুমি এখন এর দিকে তাকাও, সেও তখন তার দিকে তাকাল। কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর, আচার্য এখানে যে ঈশ্বরের কথা বলছেন, এখানে তো ঈশ্বরকে নিয়ে আসার কথাই ছিল না, আচার্যই নিজে নিয়ে এসেছেন, এই ঈশ্বরের সাথে আচার্য কোথাও আত্মার বিভেদ করছেন না। বিভেদ কখন হবে না? যখন বলা হবে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন। এই ঈশ্বরের কথা যখন বলা হবে, সেই ঈশ্বরকে তখন আচার্য মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে যে ঈশ্বরকে মানা হয়, তা আমার আপনার থেকে আলাদা এক সত্তার ঈশ্বর। সব ধর্মই সমান যদি বলা হয় তাহলে সব ধর্মের যে ঈশ্বর মানা হয় সেই ঈশ্বরও এক। সব ধর্মের ঈশ্বর যদি এক হয় তাহলে কোন খ্রীশ্চানকে যদি বলা হয়, ঐ যে খুনী আসামীকে ফাঁসিতে ঝোলাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে হচ্ছে তোমার যিশু, কোন খ্রীশ্চান মানবে? কখনই মানবে না। কিন্তু বেদান্তে কোন আপত্তি করবে না, বলবে, হ্যাঁ সেই ঈশ্বর এর মধ্যেও বিরাজমান, তিনিই এই রূপে খেলা করছেন। যখন ব্যক্তি ঈশ্বরকে নিয়ে আসা হয় তখন মনে করা হয় ভগবান এই এতটুকুই, এর বাইরে ভগবানকে ভাবা যায় না। এইটাই সমস্যা। আর আমরা যদি স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর বাদেই ভগবানের কথা বলি, কিন্তু মনের সংস্কার বশতঃ অবধারণাতে কোথাও না কোথাও ঈশ্বরের সাথে স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর এসে পড়ে। বেদান্ত ঐ ঈশ্বরকে মানে না। কিন্তু যিনি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, বেদান্তের কাছে তিনিই আত্মা তিনিই ঈশ্বর, আবার তাঁকেই ব্রহ্ম বলছেন, কোথাও কোন বিভেদ নেই। যিনি আত্মা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, নিত্য। খ্রীশ্চান বা ইসলামদের ঈশ্বর যেমন বেদান্তের ঈশ্বর নয় ঠিক তেমনি দ্বৈতবাদীদের ঈশ্বর অদ্বৈতবাদীর ঈশ্বর নয়। দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর আর খ্রীশ্চানদের ঈশ্বর এক, এদের কাছে ঈশ্বর আলাদা আমি আলাদা।

অনেকে যে মনে করে অদ্বৈতবাদীরা এতটুকুকে ধরে বসে আছে, ঈশ্বরকে ধরছে না, ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়। বেদান্তী যারা, আচার্যের মতে যারা ঠিক ঠিক বেদান্তী তারা সবটাই নেন। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈবাদীরা খণ্ডকে নিচ্ছে কিন্তু যে ঠিক ঠিক বেদান্তী, যেমন আচার্য শঙ্কর, স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা পুরোটাই নিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারে বলা হয় তিনি সর্বধর্ম সমন্বয় করেছিলেন। তাহলে কি বলা যাবে হিন্দুদের যে মত, খ্রীশ্চান ধর্মের যে মত আর ইসলাম ধর্মের যে মত, এই তিনটে মতকে কি তিনি সমন্বয় করেছেন? একেবারেই নয়, এই সব ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের পুরো চিত্রটাকে নিয়েছেন, ঐ চিত্রের মধ্যে হিন্দুরও স্থান আছে, খ্রীশ্চানেরও স্থান আছে আর ইসলামেরও স্থান আছে। কিন্তু যে হিন্দু ছবির মধ্যেই নিজেকে আটকে রেখেছে সে খ্রীশ্চান ছবিকে আর দেখতে পায়না। সব ধর্মই একই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এটাকে বোঝার জন্য যতক্ষণ বেদান্তের জ্ঞান না হবে, বেদান্তের রঙে নিজেকে যতক্ষণ রঞ্জিত না করতে পারবে ততক্ষণ এটা ধারণা করা যাবে না। এই ধারণা এক ছিল আচার্য শঙ্করের আর তারপর আমাদের ঠাকুর, স্বামীজীর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের পূর্ণাঙ্গ রূপের ছবিটাকে নিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তার মধ্যে স্বামীজী যদিও পুরো বেদান্তকে নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি

অদ্বৈতের উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। স্বামীজী নিজেও বলছেন আমি জেনে বুঝেই অদ্বৈতের উপর বেশি জোর দিয়েছি, কিন্তু তাঁর কাছে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত ভুল কিছু ছিল না। এর সব কিছুকে নিয়েই অদ্বৈত। অদ্বৈত তাই দ্বৈত রূপেও ভাসছে আবার বিশিষ্টাদ্বৈত রূপেও ভাসছে। বিভিন্ন দর্শনে আত্মা, ব্রহ্ম আর ঈশ্বরকে আলাদা ভেবে নিয়ে যে ভুলটা হয় অদ্বৈত বেদান্তে সেই ভুলটা হয় না, অদ্বৈত বেদান্তে তিনটেই এক। কিন্তু এই ব্যাপারটা সবাইকে বুঝতে হবে যে, দ্বৈতবাদীদের কাছে ঈশ্বরের যে সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞার থেকে অদ্বৈতবাদীদের ঈশ্বর আলাদা। আচার্যও এখানে দ্বৈতবাদীদের এই ঈশ্বরের সংজ্ঞাকেই আক্রমণ করছেন। ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী হন তাহলে তিনি সব কিছুতেই আছেন, এই বোতলটাও তাঁরই একটা রূপ। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশ্যপু বলছে, এই থামের মধ্যেও কি তোমার বিষ্ণু আছে? প্রহ্লাদ বলছে – হ্যাঁ এই থামের মধ্যেও তিনি আছেন। হিরণ্যকশ্যপু থামের উপর আঘাত করতেই থাম থেকে ভগবান নৃসিংহ অবতার হয়ে বেরিয়ে এলেন। এইটিই হচ্ছে ঠিক ঠিক বেদান্ত।

বিভিন্ন প্রবন্ধ, রচনা পড়ে, বক্তৃতা শুনে আমাদের অনেকেরই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে আচার্য শঙ্কর ছিলেন ঘোর অদ্বৈতবাদী, তিনি যেন ভগবান মানেন না, অবতার মানেন না। ঠাকুরও বলছেন জ্ঞানীদের জন্য অবতার নেই। অদ্বৈত আবার দুই রকমের, একটা আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত আরেকটা আবার দ্বৈতবাদীদের মত মতুয়া বুদ্ধি সম্পন্ন অদ্বৈত। এরা আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেবে না, ঈশ্বরের নাম তারা মুখেই আনবে না। এদের কাছে এই জগৎটা মিথ্যা। কিন্তু আচার্য শঙ্কর কোথাও বলবেন না যে জগৎটা মিথ্যা। ঠাকুরও কোথাও বলেননি যে জগৎটা মিথ্যা। কিন্তু যারা ঘোর অদ্বৈতবাদী তারা বলবে ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়। এদের দৃষ্টিভঙ্গীটা ঐ একটা জায়গাতেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আছে, এরা হল একাঙ্গী। কিন্তু সবটাকে নিয়েই বেদান্ত, বেদান্তে শক্তিরও স্থান আছে, কালীরও স্থান আছে, শ্রীকৃষ্ণেরও স্থান আছে আবার শিবেরও স্থান আছে। এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক অদ্বৈত। শ্রীমা যখন বলছেন – ঠাকুর ছিলেন অদ্বৈত, তোমরাও অদ্বৈত। এই অদ্বৈত বলতে বোঝাচ্ছে বেদান্তকে, আচার্যও সব কিছুকেই নিয়ে এগিয়ে গেছেন। বেদান্ত একটা ক্যানভাস, এই ক্যানভাসে সবার ছবির কোলাজ করে একটা সমন্বয় চিত্র অঙ্কতি করা হয়েছে। এখন সেই ক্যানভাসের একটা বিশেষ ছবি দেখে কেউ মুগ্ধ হয়ে গেছে, অন্য ছবির দিকে সে আর দৃষ্টি দিচ্ছে না, তখন সে মনে করছে ঐ বিশেষ ছবিটাই শুধু আছে ওর বাইরে আর কিছু নেই। বেদান্ত পুরো চিত্রটাকে নিয়ে আধ্যাত্মিকতার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বেদান্তের সামগ্রিক চিত্রটাকে শঙ্কর, ঠাকুর, স্বামীজী নিয়েছিলেন বলেই এনারা ঠিক ঠিক বেদান্তী। আসল অদ্বৈত, আসল বেদান্ত, আসল ধর্ম এক। ঠিক ঠিক ধর্ম বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে বেদান্ত। আবার ঠিক ঠিক বেদান্ত বলতে যেটা বোঝায় সেটা অদ্বৈত বেদান্তকেই বোঝায়। বাকি সব কিছু বেদান্তের অঙ্গ। অদ্বৈত বেদান্তেই যখন বলবে ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়, তখন এটাও অদ্বৈত, কিন্তু এটা একাঙ্গী। আবার যখন বলছে শ্রীকৃষ্ণই সব, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, তখনও বেদান্ত, এটাও একটা পথ, কিন্তু এখানে ধর্ম সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি। যাদের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ তাদেরকে কিছুতেই বেদান্তের সামগ্রিক ভাবকে বোঝান যাবে না। আমাদের ভাব ঠাকুরের ভাব, ঠাকুরের ভাব সবটাকে নিয়ে, আচার্য শঙ্করেরও এই ভাব।

এবার যে আত্মা ঈশ্বর রূপে এসে গেলেন, মানে কার্যের মধ্যে এসে গেলেন। তিনি কি কার্য করেন, তিনি তো সর্বজ্ঞ? সেইজন্য বলছেন – *যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ*, উপনিষদের নিয়মে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর শব্দটা যে রকম আসবে ঠিক সেই রকমই উচ্চারণ করতে হবে, সন্ধি ভেঙ্গে শব্দগুলি এই রকম হবে *যাথা-তথ্যতঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ*, সংস্কৃতে 'ত' আর 'শ'য়ের সন্ধিতে হয়ে যায় 'চ্ছ' সেইজন্য *ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ* উচ্চারণ করতে হয়। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি কি করেন? যেমনটি মানুষ কর্মফলের সাধন করেন তেমনটি ফল তাকে দিয়ে দেন। এই নিয়মগুলিকে সামনে রেখে তিনি অর্থ দিয়ে দিয়েছেন, 'অর্থ' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে কর্তব্য বিধান। কি রকম? *যাথাতথ্যতোঽর্থান্*, যাকে যেমন তাকে তেমন দিয়েছেন। ঈশ্বরই এটা ঠিক করে রেখেছেন। কাকে *অর্থান্*, মানে কর্তব্য বিধান দিয়েছেন? এখানে বলছেন *শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ*, *শাশ্বতীভ্যঃ* মানে নিত্যকাল স্থায়ী আর *সমাভ্যঃ* হচ্ছে সংবৎসর, সংবৎসর এক শ্রেণীর প্রজাপতি। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যারা ছিলেন তাঁরাই প্রজাপতি, তাঁরাই এই সৃষ্টি সমুদয়কে চালনা করেন। প্রজাপতিরা দায়ীত্ব পালন করছেন, তাঁরা দায়ীত্ব পালন করছেন বলেই জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। প্রজাপতিরা কেন দায়ীত্ব পালন করছেন? কারণ তিনি, ঈশ্বরই তাঁদের উপর দায়ীত্ব রেখে দিয়েছেন। বেদের সংবৎসর প্রজাপতি অতি প্রাচীন ধারণা, এমনকি পুরানেও এই ধরণের কোন প্রজাপতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। মূল কথা হল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যে কাজ গুলো করছেন তাঁরা কেন সেই কাজ করছেন? ভগবান এদের দায়ীত্ব দিয়ে বলে দিয়েছেন, তুমি সৃষ্টি করবে, তুমি পালন করবে, তুমি সংহার করবে। মা কালী কেন বিনাশ করে যাচ্ছেন? তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন। এটাই উপনিষদের মত,

আমরা এখানে উপনিষদের আলোচনা করছি, আর উপনিষদে এইভাবেই বলা হচ্ছে যে, মা কালী সংহার করবেন। সেইজন্য এখানে প্রশ্ন করা যাবে না, কালী এই রকম কেন করেন, দুর্গা কেন এই রকম করছেন। উপনিষদের যে কোন বাক্যকে যদি কোন শাস্ত্র খণ্ডন করে সেই শাস্ত্রকে পরম্পরাতে আশ্রিত কোন নিষ্ঠাবান হিন্দু মানবে না। যদিও উপনিষদে এইভাবে বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও এটাই সত্য হতে বাধ্য।

উপনিষদে এখানে কিভাবে বলছেন – *যাথা তথ্যতঃ*, যার যেমনটি প্রাপ্য। যার যেমনটি প্রাপ্য এটিকে আবার খুব সুন্দর ভাবে চণ্ডীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুরান, বেদ, উপনিষদ সবাই একই কথা বলছে। সুরথ আর সমাধি মায়ের সাধনা করতে গেছে। তাদের সাধনায় মা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। তখন সমাধি বলছে আমি জ্ঞান চাই আর সুরথ বলছে আমার খুব ইচ্ছে যে আমি খুব বিরাট কিছু হব। সমাধিকে মা জ্ঞান দিয়ে দিলেন, আর সুরথকে বললেন – দেহত্যাগের পর তুমি মনু হবে, তবে এই সৃষ্টি যখন শেষ হয়ে নতুন কল্প শুরু হবে তখনই তুমি সেই কল্পে মনু হবে, এই সৃষ্টির নাশ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই যে নতুন কল্পের দায়ীত্ব সুরথকে দেওয়া হল, এটা কে দিলেন তাকে? ভগবান। ভগবান মনুকেই কেন দায়ীত্ব দিলেন? কারণ এই যে উপনিষদে বলছে – *যাথা-তথ্যতঃ*, যথা যোগ্য। যথা যোগ্য কেন হল? এইটাই চণ্ডীতে বলছে, এর আগে সে তপস্যা করেছিল। তপস্যা করেছিল বলে মা বলে দিয়েছেন তুমি পরের সৃষ্টিতে মনু হবে। এখন যদি ধরা হয়, আমিও তপস্যা করে সুরথের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আমার কি হবে? তখন মা বলবেন, দ্যাখো এর পরের মন্বন্তরের মনু ঠিক করা আছে, তুমি তত দিন স্বর্গে সুখ ভোগ কর, ঐ মন্বন্তর যখন শেষ হয়ে যাবে তারপর তুমি মনু হবে। আর ঠিক আমার পেছনে আরেকজন তপস্যা করতে থাকে তখন তাকেও মা এই একই কথা বলবেন, তুমি তার পরেরটাতে মনু হবে। তাহলে তো বিরাট লম্বা লাইন পড়ে যাবে মনু হওয়ার জন্য। আসলে সত্যি সত্যিই এই রকমই হয়। যত লম্বা লাইনই হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ সৃষ্টিতো অনাদি, সৃষ্টি চলতেই থাকবে, যার যেমন লাইন এগোবে সে সেইভাবে মনু হবে। হয়তো এমনও হতে পারে দশ মনু আগে একজন তপস্যা করে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই এখন মনু হয়েছেন। আমি যদি তপস্যা করে বলি আমি মনু প্রজাপতি হব, আমাকে এখন একটা সময় ও কাল ঠিক করে দিলেন, সেই সময় ও কাল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে আমার দশ মন্বন্তর পর মনু হওয়ার পালা আসবে। এখন এই দশ মন্বন্তর আমি বসে বসে কি করে সময় কাটাব! কোথাও বসে সুখ ভোগ করতে থাকব। দশ মন্বন্তর মানে একের উপর কত হাজার শূন্য পড়বে ঠিক নেই। এখন আমার আর শরীরও নেই, তপস্যা যে করব তারও উপায় নেই। কিছুই করার উপায় নেই এখন এই ভাবেই হাজার হাজার কোটি কোটি বছর পড়ে থাকতে হবে। শুধু সুখভোগ করছি, মনে মনে আনন্দ করে যাচ্ছি। এরপর আমি হব মনু। মনু হওয়ার পর আমার কার্য অনুযায়ী আমি নীচে কিংবা উপরে যাব। এরপর শরীর ধারণ হলে তখন আবার মুক্তির সুযোগ আসবে। এইসব দেখেই লোকে আতঙ্কিত হয়ে বলল, আমার এসব কিছুই লাগবে না বাপু, আমাকে মুক্তি দাও।

চণ্ডীতে সুরথ আর সমাধির এক সঙ্গেই দুজনের মাথায় এসেছে জঙ্গলে যাবে, একই সঙ্গে দুজন কষ্ট পেয়েছে, একই সাথে মন্ত্র পেয়েছে, এক সঙ্গে সাধনা করেছে অথচ ফলের সময় দুজন আলাদা ফল চেয়েছে, মাও ঠিক সেই রকমটি করে দিলেন, এইটাই এখানে বলা হচ্ছে *যাথা-তথ্যতঃ*। এই যে বলা হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এনারা যা কাজ করছেন এগুলো ঈশ্বর এঁদের দায়ীত্ব দিয়ে রেখেছেন। আর তাঁরা কিভাবে এটা চালান? *শাশ্বত*, ঋতম্ রূপে, ঋতম্ হচ্ছে Cosmic laws মহাজাগতিক নিয়ম। এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলেছে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কিছু নিয়ম আছে, এই নিয়মগুলো জাগতিক স্তরের নয়, এগুলো সূক্ষ্ম স্তরের। যেমন ইন্দ্র দেবতা, তাঁকে বলে দেওয়া হল, তুমি দেবতা হয়েছ তাই তোমাকে বৃষ্টির দায়ীত্ব নিতে হবে, ইন্দ্র এখন এই নিয়মের মধ্যে বাঁধা হয়ে গেলেন, তাঁকে এটা করতেই হবে। রেলওয়ে এনকোয়ারীতে যে লোকটি বসে আছে তার কাছে কেউ কোন তথ্য জানতে চাইলে তাকে সেই তথ্য দিতেই হবে, না দিলে তার পাপ লাগবে, এই কাজের জন্যই তাকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। ইন্দ্রকেও এই কাজের জন্যই রাখা হয়েছে। ইন্দ্র যদি না করেন? কোন প্রশ্নই নেই না করার, ইন্দ্র এই কাজ করবে না এটা কল্পনাই করা যায় না। সেইজন্য কঠোপনিষদে বলা হচ্ছে – *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*, ঈশ্বরের ভয়ে এরা সবাই ঠিক ঠিক কাজ করছে। সেইজন্য যত দেবতারা আছেন, প্রজাপতিরা আছেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু আছেন, এনারা কখনই নিজের কাজ ছেড়ে অপরের কাজে নাক গলাতে যাবেন না বা নিজের কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারবেন না কারণ এনারা ঋতমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। মানুষ কাজে ফাঁকি মারবে, চুরি চামারি করবে, কিন্তু ওপরের দিকে যাঁরা আছেন তাঁরা কখনই ঋতমের বাইরে যাবেন না। *ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ*

সমাভ্যঃ, সমাভ্যঃ হচ্ছে সংবৎসর প্রজাপতি, এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবাইকে নিয়েই বলা হচ্ছে, তাঁদের যে দায়ীত্বটা দেওয়া হয়েছে, এই দায়ীত্বটা দিয়েছেন ভগবান নিজে। এই হচ্ছে এই মন্ত্রের বক্তব্য।

এই মন্ত্রে দুটো জিনিষকে তুলে ধরা হয়েছে, একটা হচ্ছে ভগবানের স্বরূপ। কি সেই স্বরূপ? *স পর্যগাৎ*, তিনি অনন্ত। ভগবানকে অনন্ত বলার পর তাঁর কোন ধরণের শরীরকে অস্বীকার করা হচ্ছে, তাঁর সূক্ষ্ম শরীর নেই, তাঁর স্থূল শরীর নেই, তাঁর কারণ শরীর নেই। এইভাবে নেতি নেতি করার পর ভগবানের গুণের কথা বলা হচ্ছে। কি কি সেই গুণ? *কবির্মনীষী*, ত্রিকালদর্শী ও সর্বজ্ঞ, *পরিভূঃ*, সবার উপরে, *স্বয়ম্ভূঃ* নিজেই নিজের কারণ। এই স্বয়ম্ভূই গীতায় হয়ে যাচ্ছে – *অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো*, এই *অজো* (জন্মরহিত) এখানে *স্বয়ম্ভূঃ*, যাঁর জন্ম হয় না সেটাকেই এখানে অন্য ভাষায় বলছেন *স্বয়ম্ভূঃ*, তিনি নিজেই হয়েছেন। সেইজন্য শিবকে বলা হয় স্বয়ম্ভূ, সেখান থেকে শিবকে বলা হয় শিব শিব শম্ভো। তিনিই আছেন, তিনি হন না।

ভগবনের কাজ কি? এই যে প্রজাপতি থেকে শুরু করে যত দেবতারা হয়েছেন, এনারা সবাই এর আগের আগের জন্মের মন্বন্তরে যে যা পূণ্যকর্ম গুলো করেছিলেন সেই পূণ্যকর্মের ফল এবার আস্তে আস্তে যাঁর যেটা প্রাপ্য তাঁর কাছে চলে গেছে। কেন ঠিক ঠিক তাঁদের কাছে চলে যাচ্ছে, কারণ পেছনে ভগবান আছেন বলে। ভগবান কি সুপার কম্প্যুটার নিয়ে এগুলো ঠিক করছেন? না। ঋতমের সাহায্যে তিনিই সব ঠিক করে দিচ্ছেন। যেমন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, এক গাছের দুটো ফল, গাছ থেকে পড়ার সময় একটা আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে না, যখন পড়বে তখন দুটো ফলই নীচে মাটিতে পড়বে। কারণ, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কাজ করছে, এই নিয়মকে অতিক্রম করার কারুর অধিকারই নেই। আগুনের ধুঁয়ো কখনই বলতে পারবে না যে আমি উপরের দিকে যাবো না, যতক্ষণ না তাকে বাধা না দেওয়া হয় ততক্ষণ তাকে উপরের দিকেই যেতে হবে। ঠিক তেমনি যে যেমনটি কর্ম করছে তার ফল ঠিক সেই জায়গাতেই পোঁছে যায়, যার যেটা পাওয়ার তার কাছে সেটা পোঁছে যাবে।

এই হয়ে গেল আত্মতত্ত্বের বর্ণনা। এর পরের ছয়টি মন্ত্রের অর্থ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। যে কোন কারণেই হোক, আমাদের ভাষ্যকার এই ছটি মন্ত্রের ভাষ্য দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু নিজের থেকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা কোথাও দেননি। পরের দিকের ভাষ্যকাররা বলেই দিচ্ছেন যে এর অর্থগুলি তাদের কাছেও পরিষ্কার নয়। কারণ এই উপনিষদ এতই পুরনো যে এর শব্দগুলোকে যে কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে পরিষ্কার হয় না, আর যার ফলে এর ভাবগুলিও পরিষ্কার হয় না। আমাদের ভাষ্যকার যেভাবে বলেছেন সেইভাবেই আমরা দেখব।

মূল ব্যাপারটা হল আগামী ছটি মন্ত্রে সমুচ্চয় প্রশংসা করা হচ্ছে। এই ঈশাবাস্যোপনিষদ যখন ঋষির মন থেকে বেরিয়ে শিষ্যদের মধ্যে প্রবেশ করছিল, তারও হাজার হাজার বছর আগে ভারতে আরও যত ধরণের চিন্তা ভাবনা ছিল তারও কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা এই উপনিষদ রচিত হবার সময় মানুষের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। ঋষি সেই চিন্তা ভাবনাগুলোকেও টেনে নিয়ে এসে সমুচ্চয় করছেন। সারা ভারতে একটা ভাবকে প্রসার পেতে কত সময় লেগেছিল, তখন না ছিল টেলিভিশন, না ছিল টেলিফোন, না ছিল রেডিও। তাই ভাবতে অবাক লাগে একটা ভাবকে সারা ভারতে ছড়াতে কত সময় লেগেছিল। এখনে বোঝা যাচ্ছে যে দু রকমের ভাব তখন দুদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এক সম্প্রদায় বলছে এটা ঠিক আরেক সম্প্রদায় বলছে এই ভাবটা ঠিক। এবারে তৃতীয় সম্প্রদায় এসে বলছে, না, তোমাকে এটাও করতে হবে ওটাও করতে হবে। এটাকেই বলা হচ্ছে সমুচ্চয়। সমুচ্চয় মানে তুমি এটাও করবে ওটাও করবে। সমুচ্চয় আর সমন্বয় এক নয়, সমন্বয়ে বলবে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক। স্বামীজীর যে চারটে যোগের কথা আছে, এই চারটে যোগ একদিকে যোগ-সমন্বয় অন্যদিকে কিন্তু এই চারটে যোগ যোগ-সমুচ্চয়। যখন স্বামীজী বলছেন জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের যে কোন পথে চলে যেতে পার, তখন এটা হয়ে গেল যোগ-সমন্বয়, কিন্তু তিনি যখন বলছেন হয় তুমি একটা পথকে নাও, আর নয়তো সব কটি পথকেই এক সঙ্গে নাও, তখন এটা হয়ে গেল সমুচ্চয়। যে কোন একটা পথ দিয়ে চলে যেত পার তখন এটা হচ্ছে সমন্বয়, যেমনি বলছে একাধিক পথ দিয়ে যেতে পার তখন এটাই হয়ে যাচ্ছে সমুচ্চয়।

সমুচ্চয়ে কি হয়? দুটো আলাদা বিষয়, একটির সাথে আরেকটির কোন মিল নেই। এখন বলছে দুটোকেই তোমাকে ধরতে হবে। বলে, দুই নৌকায় পা দিতে নেই, কিন্তু সমুচ্চয়ে দুই নৌকাতেই পা দিতে হবে তা নাহলে তুমি নদী

পেরোতে পারবে না। সমন্বয়ে বলা হয় এও যা সেও তা, তোমরা দুজনে একই কথা বলছ। ঠাকুর যে ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন সেখানে তিনি বলছেন, সব পথই সমান, যে পথেই যাওনা কেন তুমি একই জায়গাতে গিয়ে পৌঁছাবে। কিন্তু ঠাকুর যদি বলতেন প্রথম পাঁচ বছর খ্রীশ্চান ধর্ম করবে পরের পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম করবে, তখন এটা হয়ে যেত সমুচ্চয়। তখনকার দিনে দুই ধরণের লোক দেখা যেতে, অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা শুধু যজ্ঞাদিকেই বেশি গুরুত্ব দিত আর খুব জাঁকজমক করেই যজ্ঞ করতেন। আরেক ধরণের ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা যজ্ঞের অভিমানী দেবতাদের উপাসনাতেই মন দিত, অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদিতেই লেগে থাকত। যারা কর্মী অর্থাৎ যজ্ঞই করত তারা এদের দেখলেই গালাগাল দিত। তোমরা কোন কাজ কর্ম করছ না তাই মৃত্যুর পর তোমরা নরকে যাবে। এরা আবার কর্মীদের বলত, এরা সারাদিন হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে, নিজেরা ভালো মন্দ খাবে বলে যজ্ঞাদি করে বেড়াচ্ছে। মূল কথা হল যারা কর্ম করছে তারা উপাসকদের নিন্দা করত আর যারা উপাসক তার কর্মীদের নিন্দা করত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক পর্যায়ে এই নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। স্বামীজী বলছেন তোরা খাটতে খাটতে মরে যা, আর ঠাকুর বলে গেছেন আগে ঈশ্বর দর্শন তারপর কর্ম। বেদের সময় থেকেই এই সমস্যাটা চলে আসছে।

আচার্য শঙ্কর এই মন্ত্র কটির উপর ভাষ্য দিতে গিয়ে দেখাচ্ছেন উপনিষদ এখানে কি বলতে চেয়েছেন, কি উদ্দেশ্যে বলছেন। এর ওপর তিনি বিরাট লম্বা ভাষ্যে যুক্তি দিয়ে বলছেন, এটা হচ্ছে সমুচ্চয় প্রশংসা, এটাও করবে ওটাও করবে। এই দুটো করলে কি হবে? *বীর্যতরম্ ভবতি*, ছান্দোগ্য উপনিষদে এই কথা বলছেন, যখন কোন কিছু বুঝে নিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে করা হয় তখন ঐ জিনিষটার ফল আরও ভালো পাওয়া যায়। এইটাই বলতে চাইছেন, তুমি কর্ম করবে, এখানে কর্ম মানে যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে, সাথে সাথে যজ্ঞের যিনি দেবতা তাঁর উপাসনাও করবে। মানুষতো সব সময় কর্ম করেছে না, একজন ব্রাহ্মণ কতক্ষণ যজ্ঞ করবে, চার থেকে পাঁচ ঘন্টাই যজ্ঞ করবে, বাকি সময় ব্রাহ্মণ কি করবে। গ্রাম দেশে যেখান মন্দিরাদি আছে, সব সময় লোকজনও বেশি আসেনা, মন্দিরের পুরোহিতরা যখন কোন কাজ না থাকে বসে বসে তাস খেলবে, হঠাৎ যদি দেখে অসময়ে বাইরে থেকে কোন আগন্তুক ভুল করে এসে গেছে, তখনই তাস খেলা বন্ধ করে তাকে পূজো দেওয়াতে পৌঁছে যাবে। এই পূজা কর্ম কখন করে? যখন যজমানকে দেখে। বাকি সময় কি করছে? তাস খেলছে বা অন্য কিছু করছে। এর ফলে পূজা কর্ম করার পরেও যে তার মনকে উচ্চ ভাবনা চিন্তাতে রাখবে, সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেইজন্যই এখানে সমুচ্চয়ের কথা বলা হচ্ছে।

উপনিষদের ব্যাপারে একটা জিনিষ আমাদের ভালো করে মনে রাখা দরকার, উপনিষদে বা বেদে অনেক সময় একটা জায়গায় এক রকম কথা বলছে, তারপরেই ঠিক তার বিপরীত কথা বলছে। যেমন একটা জায়গায় বলছে যজ্ঞে হিংসা করবে, আরেকটা জায়গায় বলছে যজ্ঞে হিংসা করবে না। এইজন্যই বলা হয় শাস্ত্র অধ্যয়ণ, বিশেষ করে উপনিষদ পড়তে গেলে ভালো আচার্য বা গুরুর দরকার পড়ে। বেদেই বলছে হিংসা শুধু মাত্র যজ্ঞেই করবে, যজ্ঞের বাইরে হিংসা করবে না। আবার বলছেন যজ্ঞে হিংসা করবে না। যখন কোন কিছু করতে নিষেধ করা হয়, যদিও সেটাকে আগে করতে বলা হয়েছে, সেটাকে না করতে বলে দেওয়াটা নিন্দা করার জন্য বলা হয় না। অন্য জিনিষটাকে প্রশংসা করার জন্য। যারা বেদ অধ্যয়ণ করেন তাদের জন্য এই ব্যাপারটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। বেদের সমালোচকরা বেদের বিরুদ্ধে এইটাই বলে, তোমরা এক জায়গায় এক রকম কথা বলছ, অন্য জায়গায় তার বিপরীত কথা বলছ। শঙ্করাচার্যের অনেক আগেই যখন জৈমিনীর সূত্রাদি লেখা হয় তখন এইটাই সিদ্ধান্ত ছিল যে, যখনই একটা কোন কিছু বলা হচ্ছে, আবার বেদেই যদি ঐটাকে নিন্দা করা হয় তখন সেই নিন্দা করার অর্থ সব সময়ই অন্যটাকে প্রশংসা করা। এখানে দুটো জিনিষ আসছে, হিংসা করবে আর হিংসা করবে না যখন বলা হচ্ছে, তার মানে হিংসা তুমি করতে পার, যদি হিংসা না কর তাহলে সেটা আরও ভালো। তার মানে হিংসা না করাটাকে প্রশংসা করা হচ্ছে।

এখন যে মন্ত্রে আমরা ঢুকবো এখানে প্রথমটাকে নিন্দা করা হচ্ছে, দ্বিতীয়টাকে আরও নিন্দা করা হচ্ছে। কেন আরও নিন্দা করা হচ্ছে? তৃতীয়টাকে আনার জন্য। এই তৃতীয়টাই সমুচ্চয়। এখানে দুটো পথ যাচ্ছে কর্মের পথ আর উপাসনার পথ। প্রথমে কর্মের নিন্দা করবে, অথচ যজ্ঞই বেদের ধর্ম। কেন কর্মের নিন্দা করা হচ্ছে? উপাসনার প্রশংসা করার জন্য। এরপর উপাসনার আরও বেশি নিন্দা করবে। কেন উপাসনাকে নিন্দা করছে? তৃতীয় একটা জিনিষের জন্য করা হচ্ছে। তৃতীয়টা কি? সমুচ্চয়। তুমি এটাও করবে ওটাও করবে। এটা যদি কর তাহলে তুমি গোল্লায় যাবে। তাহলে আমি কি ওটা করব? একটাই যদি কর তাহলে ওটা করলে তুমি নরকে যাবে আর এটা করলে তুমি গোল্লায় যাবে। তাহলে

আমি কোনটা করব? তুমি এটাও করবে ওটাও করবে। এইটাই সমুচ্চয়। একজন পুরোহিত সারাক্ষণ চাষবাশ করছে আর যজমান দেখলে পূজো করাতে ছুটে আসছে। এখন এই পুরোহিত ভক্তি পথে কতদূর এগোতে পারবে? কিছুই হবে ন। ঠাকুর হাজরা মশায়ের বর্ণনা করছেন, ঠাকুরের ঘরের সামনে বসে জপ করত আবার দেখছে কে কে ঠাকুরের কাছে আসছে। ঠাকুর এখানে হাজরার নিন্দা করছেন। সেইজন্য বলা হচ্ছে তুমি কর্ম করবে, কর্ম না থাকলে উপাসনা করবে। উপাসনাও করবে, উপাসনাকে ঠিক জায়গায় রাখার জন্য কর্ম করবে। দুটোকে নিয়ে চললেই সর্বাঙ্গ রূপে সাধন হয়। হাত, পা, শরীর, মন, বুদ্ধি সবটাই সাধনার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তখনই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে থাকে। একটাকে নিয়েই যদি তুমি লেগে যাও তাহলে ওতেই তুমি আটকে থাকবে। এটাকেই বলা হচ্ছে সমুচ্চয়। সমুচ্চয়ের একটা উদ্দেশ্য যাতে তোমার সর্বাঙ্গীন বিকাশ হতে পারে।

শুধু ঈশাবাস্যোপনিষদেই সমুচ্চয় প্রশংসা করা হচ্ছে না, অন্যান্য অনেক উপনিষদেও সমুচ্চয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। তখনকার দিনে দুটো ধারা চলে আসছিল, দুটো ধারার যে কোন একটা ধারাকে নিয়ে এগোলে তোমার এই এই হবে। তোমাকে এটাও করতে হবে ওটাও করতে হবে। এই কথা বলবে না যে, শুধু এটাই করবে, আবার এটাও বলবে না যে দুটো ধারাই সমান। এখানে পরের ছটি মন্ত্রে সমুচ্চয়ের প্রশংসা করা হচ্ছে। কঠোপনিষদে পণ্ডিতরা কিছু কিছু জায়গায় সমুচ্চয়ের কথা বলবেন, কিন্তু বিশেষ করে গীতাতে এসে এই সমুচ্চয়ের বিরুদ্ধেই পণ্ডিতদের মধ্যে লড়াই লেগে যাবে। উপনিষদে ঋষিরা সমুচ্চয়ের কথা বলা গেছেন বলে পণ্ডিতদের কাছে সমুচ্চয়ের ব্যাপারটা ধারণার মধ্যে ছিল। পরের দিকে যখন গীতা এসে গেল তখন এই পণ্ডিতরাই তখন বলে দিলেন গীতা হচ্ছে সমুচ্চয় শাস্ত্র। কিন্তু আচার্য শঙ্কর গীতাকে কিছুতেই সমুচ্চয় শাস্ত্র বলবেন না, তিনি তাঁর ভাষ্যে থেকে থেকেই এই সব পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে, যাঁরা গীতাকে সমুচ্চয় শাস্ত্র বলছেন, আক্রমণ করেছেন। গীতাতে সমুচ্চয়ের কোন ব্যাপারই নেই, আর গীতাতে কোন সমন্বয়ও করা হচ্ছে না, পরিষ্কার দুটো পথের কথা বলে দেওয়া হচ্ছে। কি দুটো পথ? জ্ঞান পথ শুধু মাত্র সন্ন্যাসীদের জন্য আর কর্ম পথ হচ্ছে অজ্ঞানীদের জন্য, গীতাতে পরিষ্কার এই দুটো পথের কথা বলে দেওয়া হল। যারা দু হাজার বছর ধরে সমুচ্চয় সমুচ্চয় করে এসেছে তাদের হাতে যখন গীতা এসে গেল, তারা দেখাচ্ছেন, কেন গীতাতে পরিষ্কার জ্ঞান আর কর্মের সমুচ্চয় করা হচ্ছে, উপনিষদেও আমরা এই জিনিষ দেখে এসেছি। আচার্য তখন বলছেন, ওখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা পুরো আলদা আর গীতাতে যেটা বলা হচ্ছে সেটা একেবারে অন্য রকম। উপনিষদের বেলায় আচার্য সমুচ্চয়ের প্রশংসা করবেন কিন্তু গীতাতে গিয়ে সমুচ্চয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবেন। আচার্য দেখাচ্ছেন জ্ঞান আর কর্মের মাঝখানে পাহাড়ের মত ব্যবধান, দুটোই পুরো আলাদা, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কখনই কোন ধরণের সমুচ্চয় হতে পারেনা। উপনিষদে যে বিদ্যা আর অবিদ্যা ও জ্ঞান ও অজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে, গীতাতেও জ্ঞান ও কর্মের কথা বলা হবে কিন্তু এখানে যে জ্ঞান আর কর্মের কথা বলা হচ্ছে তার থেকে গীতার জ্ঞান ও কর্ম আলাদা। আবার ঠাকুর যেটা বলছেন, এক হাতে কর্ম কর আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধর, সেটা আবার এগুলোর থেকে আলাদা।

আচার্য এখানে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ভাষ্যে বলছেন, প্রথম দুটি মন্ত্রে দুটো আলাদা পথের কথা বলা হচ্ছে। প্রথম মন্ত্রে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল, দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মনিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। যাঁরা জ্ঞাননিষ্ঠার সাধনা করবেন তাঁদের জন্য সাধনা হচ্ছে *মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্*, তুমি কোন লোভ করো না, কোন ধরণের ঘৃণা ভাব তোমার মনের মধ্যে যেন প্রবেশ না করে। আর দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মনিষ্ঠা বা গৃহস্থের জন্য বলা হয়েছিল *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি*। এইভাবে বলতে বলতে আচার্য বলছেন শাস্ত্রে এই দুটি পথের কথা, যেটাকে প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ দিয়ে বলা হয়, সব জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে, যারা গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে চায় তাদের এক ধরণের পথ আর যারা সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে চাইছে তাদের অন্য এক ধরণের ধর্মকে পালন করতে বলা হচ্ছে। ঈশাবাস্যোপনিষদেও ঠিক তাই করা হয়েছে। সব উপনিষদেই যে দুটো পথের কথা বলা হয়েছে তা নয়, যেমন কঠোপনিষদ বা মুণ্ডকোপনিষদে দুটো ধর্মের কথা নেই। কিন্তু এখানে যে দুটো পথের কথা বলা হচ্ছে এতে দোষের কিছু নেই, কারণ বেদের ধর্মই এই রকম।

ঈশাবাস্যোপনিষদে সন্ন্যাসিদের জন্য বেশ কিছু কথা বলা হয়েছে, যেমন *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক*, তুমি এটাই সাধনা করবে আর সিদ্ধিটাও তাই হবে। কিন্তু যারা সংসারে থাকতে চাইছে, গৃহস্থ জীবনের দিকে আকর্ষণ আছে, তারা কিভাবে সংসারে থাকবে, এই নয় নম্বর মন্ত্র থেকে শুরু করে প্রায় শেষ মন্ত্র পর্যন্ত এটাকে নিয়েই আলোচনা করবেন। প্রথমেই বলছেন তোমাকে কর্ম আর উপাসনাকে সমুচ্চয় করতে হবে –

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।৯

ঈশাবাস্যোপনিষদ যে কত প্রাচীন, এর প্রাচীনত্বর ব্যাপারে আমরা ধারণাই করতে পারবো না। মহাভারতের কিছু তথ্য ও ঘটনাবলীকে প্রামাণ্য ধরে নিয়ে সেই সময়ের গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে দেখা যায় যে আজ থেকে পনেরশ খ্রীষ্টপূর্বে মহাভারত রচনা হয়েছিল। মহাভারতেই আবার উপনিষদের অনেক কিছুর বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বলেন ঈশাবাস্যোপনিষদ আড়াই হাজার বছর আগেকার, কিন্তু এটা কারুর কাছেই বিশ্বাস যোগ নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে সমস্যা হচ্ছে যিশু খ্রীষ্টকে নিয়ে, এরা যিশুর আগে কোন ধর্ম বা কোন দর্শনকে কিছুতেই স্বীকার করবে না, যা কিছু হয়েছে সব ঈশার পরে। পরের দিকে কিছু তথ্যের আবিষ্কারের পর এরা অনেক কিছু মেলাতে না পেরে খুব কষ্ট করে বুদ্ধ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। এদের মতে এখন ভারতে যা কিছু হয়েছে সব বুদ্ধের পরে। আমাদের যে জনশ্রুতি তাতে দেখা যায় যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল তখন ব্যাসদেব বেঁচে ছিলেন, তিনি মহাভারত রচনা করেছেন, তিনি আবার বেদ উপনিষদকে বেঁধে দিয়েছেন। তার মানে বেদ উপনিষদকে ব্যাসদেবের আগে যেতেই হবে, এছাড়া কোন পথই নেই। তাহলে এমনিতেই বেদ উপনিষদ সাড়ে তিন হাজার বছর ছাড়িয়ে গেল। একটা জিনিষ কত বছর ধরে মানুষের মধ্যে প্রচল থাকার পরে সেই জিনিষটাকে বাঁধার দরকার পড়ে। যেমন বাংলা ভাষা, এই ভাষা অনেক দিন ধরে চলে আসছে, তারপর একটা সময়ে এসে বৈয়াকরণরা ভাষাটাকে ব্যাকারণের নিয়মে বাঁধতে শুরু করলেন। এখন তো জনসংযোগ কত উন্নত হয়ে গেছে, তখনকার দিনে না ছিল টেলিফোন, না টেলিভিশন, যাতায়াতেও না ছিল ট্রেন, বাস, উড়োজাহাজ, যার জন্য তখনকার মানুষদের চলাচল খুব সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সিন্ধুঘাটী থেকে একটা ভাব ছড়াতে ছড়াতে বাংলা বিহার আসামে ছড়িয়েছে, সেখান থেকে আবার সুদূর দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়েছে, সারা ভারতে ছড়িয়ে গিয়ে মানুষের মধ্যে স্থায়ী ভাবে বসার পর একটা জিনিষকে বাঁধার দরকার হচ্ছে। তাই বেদ-উপনিষদের প্রাচীনত্ব আমাদের ধারণার অতীত। তার ওপর বিশেষ করে ঈশাবাস্যোপনিষদে ঋষি যে মন্ত্রগুলো বলছেন, এর অনেক শব্দ এখন হারিয়েই গেছে, তাই ঈশাবাস্যোপিনষদ যে কত পুরনো কেউই ধারণা করতে পারবে না। এখানে ঋষিরা যে ভাবনা চিন্তাগুলোকে গেঁথে দিয়েছেন, সেই ভাবনা চিন্তাগুলোও আবার তার থেকেও অনেক আগে থাকতে চলে আসছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা খুব কষ্ট করে উপনিষদকে যিশু খ্রীষ্টের আশেপাশের সময়ের রচনা বলে মনে করে। তারপরে এই সব মন্ত্রে এসে দেখা যাচ্ছে এগুলো এতই পুরনো যে পাণিনির ব্যাকারণের কোন নিয়মই পালন করা হয়নি, এতই পুরনো যে এর এখন আলাদা করে ব্যাখ্যার দরকার পড়ে, আরও সমস্যা এর ব্যাকারণও আলাদা।

এই মন্ত্রে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, যাঁরা সন্ন্যাসী নন, গৃহস্থ জীবন যাপন করছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে উপরে উঠতে চাইছেন। আমাদের এখানে মাথায় রাখতে হবে এই মন্ত্রগুলো যে কতো পুরনো আমরা জানিনা। *যেহবিদ্যামুপাসতে,* যাঁরা অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁরা *অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি,* দর্শন প্রতিরোধক অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে প্রবেশ করে। এর আগে তৃতীয় মন্ত্রে বলেছিলেন, *অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ,* যাঁরা আত্মহনন করেন, অনাত্মজ্ঞানী মানে যাঁরা আত্মজ্ঞানী নন, তাঁরা মৃত্যুর পর কোথায় যান? *অসুর্যা নাম তে লোকা,* অন্ধকারের একটা নরকে গিয়ে পড়ে, মানে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে তাঁদের ঘুরতে হয়। এখন বলছেন *অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি,* যাঁরা অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁরা মহা অজ্ঞান অন্ধকারে গিয়ে পড়ে। আর *ততো ভূয় ইব তে তমো,* তার থেকেও বেশি গভীর অন্ধকার নরকে গিয়ে পড়ে। কারা? *য উ বিদ্যায়াং রতাঃ,* যারা বিদ্যার উপাসনা করে। তাহলে কি দাঁড়াল? যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা গভীর অন্ধকার নরকে গিয়ে পড়ে, আর যারা বিদ্যার উপাসনা করে তারা তার থেকেও বেশি গভীর অন্ধকার নরকে গিয়ে পড়ে। অবিদ্যার যা ফল তার থেকেও খারাপ ফল বিদ্যার উপাসনায়, এখন এর অর্থ আমাদের মত লোকেরা কি করে বুঝবে? বোঝা সম্ভবই নয়। তখন আচার্য এই কথাই বলছে, যেটা আমরা এর আগে আলোচনা করে এসেছি। এখানে যখন দুটোকেই নিন্দা করা হচ্ছে, এটা করলে তুমি গোল্লায় যাবে, আর ওটা করলে তুমি নরকে যাবে। আসলে কোনটারই নিন্দা করা হচ্ছে না, সমুচ্চয়ের প্রশংসা করা হচ্ছে। আচার্য অবিদ্যা বলতে বোঝাচ্ছেন কর্মোপসনা, অবিদ্যার অর্থ কর্মপোসনা না করলে বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে না। কর্মোপসনা মানে যারা যজ্ঞাদি কর্ম খুব করে করে যাচ্ছে। এখনকার দিনে বলতে হবে যিনি সমাজে খুব সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন, অন্নদান বস্ত্রদান করে যাচ্ছেন, পাড়াতে বাড়ীতে খুব জাঁকজমক করে

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পুজা করছেন, বিরাট করে ভক্ত সম্মেলন করছেন, আজকে এই কনফারেন্স কাল ঐ সেমিনারে লেগেই আছেন, তারপর সব কিছুর পর এলাহি ভোগের ব্যবস্থা, এগুলোই হচ্ছে অবিদ্যার উপাসনা। যেখানেই কর্মের ব্যাপার আসবে সেটাই কর্মোপসনা, এই মন্ত্রে এই উপাসনাকে বলা হচ্ছে অবিদ্যার উপাসনা আর এই উপাসনা করলেই তুমি মহা অন্ধকার নরকে গিয়ে পড়বে। আবার *ততো ভূয় ইব তে তমো*, এর থেকেও তুমি বেশি গভীর অন্ধকার নরকে যাবে যদি তুমি *বিদ্যায়াং রতাঃ*, বিদ্যার উপাসনা যদি কর। বিদ্যার উপাসনা, মানে দেবতা সম্বন্ধীয় উপাসনা যদি তুমি কর তাহলে এর থেকে আরও বেশি অঙ্ককার নরকে যাবে।

এই মন্ত্রগুলো হচ্ছে তাদেরই জন্য যারা কর্মনিষ্ঠা, যারা কর্ম করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ পক্ষরা আচার্য শঙ্করকে আক্রমণ করবে। এই কথা শুধু কর্মীদের জন্যই কেন হবে, কেন সন্ন্যাসীদের জন্য হবে না? সন্ন্যসীদের ক্ষেত্রেও এই মন্ত্র প্রযোজ্য হতে হবে, যদি তুমি কর্ম না কর তাহলে তুমি নরকে যাবে, আর তুমি যদি পুরোপুরি জপ-ধ্যান নিয়েই ব্যস্ত থাকো তাহলে আরও অন্ধকার নরকে যাবে। তাই আপনি কেন বলছেন সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। বেদ মন্ত্র তো সবার জন্যই। যদি বলে দেওয়া হয় এই মন্ত্রটা সন্ন্যাসীদের জন্য তাহলে সন্ন্যাসীদের এক্ষুণি কাজে কর্মে নেমে পড়তে হবে। এখানে বলছে যদি তুমি কাজ কর্ম কর তাহলে তুমি নরকে যাবে, আর কাজকর্ম না করে যদি তুমি জপ-ধ্যান কর তাহলে তুমি আরও গভীর নরকে যাবে। কিন্তু আচার্য বলছেন এই মন্ত্র গৃহস্থদের জন্য আবার এরা বলছে আপনি গায়ের জোরে বলে দিলেই হবে যে এই মন্ত্র সন্ন্যাসীদের জন্য নয়। তখন আচার্য বিভিন্ন উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে দেখাতে শুরু করবেন।

এর আগের মন্ত্রে যেখানে উপনিষদ বলছেন – *যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ*, যখন এক আত্মার জ্ঞান কারুর মনে জেগে যায়, এক আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই, তখন তাঁর কি হয়? তখন তাঁর আর কোন শোক ও মোহ হয় না। এই যে আত্মার একত্ব জ্ঞান এর নাম হচ্ছে বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞান যাঁর হয়ে গেল যেখানে তাঁর আর কোন শোক থাকল না, কোন মোহ থাকল না, এই বিজ্ঞানের সাথে কখন কেউ কোন কর্ম বা জ্ঞানের সাথে মেলাতে যাবে না এটাইতো স্বাভাবিক। একজন অন্ধ ও আরেকজন খঞ্জ আছে। অন্ধকে বলা হল, ভাই তুমি কিন্তু রাস্থা দিয়ে হাঁটতে গেলে উল্টে পড়ে যাবে, খঞ্জকে বলবে তোমার যতই চোখ থাকুক তুমি তো চলতেই পারবে না। কিন্তু তোমরা যদি দুজনে বন্ধুত্ব করে নাও তাহলে তোমরা যাত্রা করে এগিয়ে যেতে পারবে। এখানে বর্ণনা চলছে অন্ধ ও খঞ্জের, এই যে বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা বলা হচ্ছে এরা একজন অন্ধ ও অন্যজন খঞ্জ। কর্ম যে করছে সে অন্ধ, যে অন্ধ সে যাবে কি করে! সে তো এক পা এগোতে গিয়েই হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়বে। আর যে উপাসনা করছে সে খঞ্জ, তার চোখ আছে, কিন্তু তার নিজের চলার ক্ষমতা নেই। এখন যার দুটো পাই ঠিক আছে, আর চোখ দুটোও পরিষ্কার, সব দিক থেকেই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক, সে কি সেধে অন্ধ আর খঞ্জের সাথে পার্টনারশিপ করতে যাবে? পার্টনারশিপ কে করতে যাবে? যার অভাব আছে সেই পার্টনারশিপ করতে যাবে। রতন টাটা কি কখন এসে আমাকে বলবে – চলুন আমি আর আপনি একটা পার্টনারশিপ বিজনেস করি? কখনই বলবে না। তবে হ্যাঁ একজনের বিরাট বিদ্যা বুদ্ধি আছে, আরেকজনের প্রচুর টাকা পয়সা আছে, এরা দুজন যদি বলে – আমরা যদি দুজনে মিলে গিয়ে ব্যবসা করতে নামি তাহলে আমরা প্রচুর সাফল্য পাব। কিন্তু যে বিল গেটসের মত বিরাট ধনী হয়ে আছে সে কেন কারুর সাথে হাত মেলাতে যাবে! আচার্য শঙ্কর ঠিক এই উপমাটাই এখানে নিচ্ছেন। তুমি যে বলছ এই মন্ত্র সন্ন্যাসীদের জন্য নয় কেন, উপনিষদেই বর্ণনা করে বলছে যিনি বিজ্ঞানী তিনিতো সব শোক মোহের পারে গিয়ে অবস্থান করছেন, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক*।

একটা নদী পেরোতে হবে, এই পারে একজন অন্ধ আর একজন খঞ্জ বসে আছে, আরেকজন আছে সে রাস্থা জেনে গেছে, যখন খুশি নদীর ওপারে যায় যখন খুশি এপারে আসে, সে কোন্ দুঃখে এই দুজনের সঙ্গে পার্টনারশিপ বিজনেস করতে যাবে। ইচ্ছে করলে সে এদের দুজনকে হাত ধরে পার করে দিতে পারে কিন্তু কোন ভাবেই সে এদের সাথে পার্টনারশিপ বিজনেস করবে না। এখানে ঠিক তাই বলছেন আচার্য। এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, যাঁর অভেদ দৃষ্টি হয়ে গেছে, যাঁর একত্ব জ্ঞান হয়ে গেছে সে কেন এই রকম করতে যাবে! কিন্তু এখানে যে কর্ম করছে তারও ভেদ দৃষ্টি আছে, যে উপাসনা করছে তারও ভেদ দৃষ্টি আছে। ভেদ দৃষ্টি যার আছে তার সাথে অভেদ দৃষ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞানীর সাথে কখনই পার্টনারশিপ হতে পারেনা, দুজনই বিপরীতে ধর্মী হয়ে গেছেন, কোথাও এদের কোন মিল নেই। আগেকার দিনে মেয়ে বা ছেলের বিয়ে দেওয়ার সময় অনেক কিছু দেখে নেওয়া হত, কুল এক কিনা, ধর্ম এক কিনা, দুটো বাড়ির আর্থিক অবস্থা এক কিনা, সংস্কৃতি এক কিনা, সব কিছু দেখার পর বিয়ের সম্বন্ধ করা হত। তারপরও অশান্তি হত, ঝগড়া বিবাদ,

মনোমালিন্য হত। এখন যত বিয়ে হচ্ছে কারুর সাথে কোন রকম মিল নেই, প্রাথমিক চাহিদা মিটে গেলে এরা কোন্ জিনিষটাকে ধরে নিয়ে নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে থাকবে? বিজ্ঞানী যিনি আর যিনি কর্মোপাসক, এঁদের কোথাও কোন কিছুর মিল নেই, সম্পর্কটা গড়ে উঠবে কি করে। এটাই আচার্য বলছেন, এটাতো স্বাভাবিক একজন সুস্থ মানুষের সাথে কি করে একজন অন্ধ আর খঞ্জের সাথে পার্টনারশিপ তৈরী হবে, অন্ধ ও খঞ্জের সাথে পার্টনারশিপ হতে পারে!

আচার্য এরপরে বলছেন, যুক্তি অর্থাৎ ন্যায় আর শাস্ত্র অনুসারে যার সঙ্গে সমুচ্চয় হওয়ার কথা তার সাথেই সমুচ্চয় হবে, এর বাইরে কোন কিছুর সমুচ্চয় করা চলে না, কোন মতেই হয় না, বিশেষ করে যখন শাস্ত্রের অর্থ নিরুপণ করা হয় তখন দুটো শর্ত পালন করা হয়, এক হচ্ছে শাস্ত্রে এই রকমটি বলা আছে কিনা, আর দুই, যুক্তিতে এটা প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে কিনা। তোমাদের তো দুটো শর্তের মধ্যে কোনটাই পূরণ করছে না। প্রথম কথা বিদ্যা আর অবিদ্যার অর্থ তোমাদের অর্থের সাথে মিলছে না, বিদ্যা আর অবিদ্যা বলতে কি বলা হচ্ছে একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা তোমাদের বক্তব্য যুক্তিতেও দাঁড়াচ্ছে না, যে বন্ধন মুক্ত সে এমন কোন লোকের সাথে পার্টনারশিপ করতে যাবে না যে অজ্ঞানী ও বদ্ধ হয়ে আছে। দেবতা উপাসনা আর কর্ম এই দুটো সমুচ্চয়ের জন্য ঠিক ঠিক জুটি। শাস্ত্রেই সমুচ্চয়ের কথা বলা হয়েছে, আর এখানে পরমাত্মার জ্ঞানের সাথে সমুচ্চয় করা হচ্ছে না। এরপর আচার্য পর পর বিভিন্ন উপনিষদ থেকে, বিশেষ করে বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছেন বৃহদারণ্যক উপনিষদ আর ঈশাবাস্যোপনিষদ দুটো একই বেদ শুক্লযজুর্বেদ থেকে আসছে। শুক্লযজুর্বেদ থেকেই বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে দেখাচ্ছেন কর্মমার্গী এভাবে যায়, উপাসনা মার্গীরা এই ভাবে যায়। এগুলো দেখানো উদ্দেশ্য যে কর্মমার্গী বা উপাসনা মার্গীরা হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর আর পরমাত্ম জ্ঞান উচ্চ শ্রেণীর কখনই এই দুটো মিলতে পারেনা।

যারা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তৎপর হয়ে কর্মোপাসনা করে, যজ্ঞাদি করে যাচ্ছে বা কোন সমাজসেবা করে যাচ্ছে, এরা মৃত্যুর পর অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে। অন্ধকারে প্রবেশ করার অর্থ হচ্ছে, এদের পুনর্জন্মটা চলতেই থাকে। আবার যখন দেবতাদিদের নিয়ে প্রচুর ধ্যান ধারণা করা হচ্ছে, এখানে দেবতা মানে ভগবান নয়, যজ্ঞের বিভিন্ন অভিমানী দেবতাদের উপাসনা করছে, তখন এরা আরও গভীর নরকে গিয়ে পড়ে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পর পর অনেকগুলো অধ্যায় এই উপাসনাকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তার মানে, এদের জন্ম-মৃত্যুর চক্রটা আরও বেশি ঘুরতে থাকবে। আরও সহজ ভাষায় এর অর্থ করা যায়, যারা কর্ম করে যাচ্ছেন তাঁদের শিঘ্রই মুক্তির আশা আছে। কিন্তু যারা শুধু উপাসনাই করে তাদের আর মুক্তির আশা সুদূর পরাহত। এটা হচ্ছে একটা ব্যাখ্যা, আমাদের জানা নেই এই ব্যাখ্যাটা কতখানি সত্য। একটা যেটা হয় তা হল, যারা কর্ম করে মানে যজ্ঞাদি করে যাচ্ছে, মৃত্যুর পর তাঁরা স্বর্গে যান। যেমনটি কর্ম করা হবে তেমনটি স্বর্গে যাবে, ভোগ হয়ে যাওয়ার পর আবার ওখান থেকে ফেরত চলে আসতে হবে। কিন্তু যারা যজ্ঞাদি না করে শুধু দেবতাদের উপাসনাই করে যাচ্ছে, তারা মৃত্যুর পর কোথায় যাবে? গীতায় বলছে – *যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্,* যে ভাব নিয়ে দেহকে ছাড়বে সে সেই ভাবটাই মৃত্যুর পর পাবে, তার মানে যে ইন্দ্রকে ভাবনা করে দেহ ছেড়েছে মৃত্যুর পর সে ইন্দ্রলোকে যাবে, সেই ইন্দ্রলোক যত দিন থাকবে তত দিন সে সেখানেই পড়ে থাকবে, কিন্তু মুক্তি তো তার হচ্ছে না। যে কর্ম করেছে সে মৃত্যুর পর হয়তো দশ বছর স্বর্গে থাকল, যে ইন্দ্রলোকে গেল সে একশ বছর সেখানে পড়ে থাকবে, মুক্তির সম্ভবনা তার নব্বুই বছর পিছিয়ে গেল। এখন আমরা কল্পনা করতে পারি যে, দুজন লোক ছিল, সুরথ আর সমাধির মত, এখন সমাধি বলল, আমার যা ভোগের ইচ্ছা ছিল মিটে গেছে আমি এবার চললাম। সুরথ দেবীর কাছে থেকে বর নেওয়ার পর কয়েক মন্বন্তর মনু হয়েছে। মনু হওয়ার পর সুরথের ইচ্ছে হল সমাধির ব্যাপারে জানার, সমাধি এখন কোথায় আছে। খোঁজ নিয়ে জানল, সমাধি যিনি ছিলেন তিনিতো আর নেই, তাঁর কারণ শরীর তো আর নেই। তাহলে সে কোথায় আছে? সুরথের তো মুক্তি হয়ে গেছে। মুক্তি হয়ে গেছে! আমিতো তার মানে ফেঁসে গেছি, আমিও মুক্তি চাই। আপনি তো মুক্তি পাবেন না, আপনি এখন মনু হয়ে আছেন, মনুর কাজের দায়ীত্বে যত দিন আছেন তত দিন আপনার তো মুক্তি হবে না। এই মন্বন্তর যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনার কর্মানুসারে যদি মানব শরীর প্রাপ্ত হন তারপরই আপনি মুক্তির চেষ্টা করতে পারবেন। তার মানে কি হল, সুরথকে এখন আরও কয়েক কোটি বছর পর্যন্ত মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এটা এক ভাবে ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু আচার্য শঙ্কর এইভাবে ব্যাখ্যা করেননি। অন্যান্য যারা ব্যাখ্যা করেছেন তারাই এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এই ব্যাখ্যা শুনেও মনে হবে এটা অনেকটা যুক্তিযুক্ত। অনেকে জপ-ধ্যান করে খুব অহঙ্কারী হয়ে যায়, যারা কাজকর্ম করে তাদের এরা নিকৃষ্ট মনে করে, আমি জপ-ধ্যান করি আমি কেন কাজ করতে যাব।

মনে করা যাক, বিদেশের কোনও আশ্রমের অধ্যক্ষ দুঃখ করে বলছেন সেই দেশের সমস্ত জিনিষের দাম আকাশ ছোঁয়া, আলুর কেজি পাঁচশ টাকা। অথচ সেই আশ্রমের প্রচুর অনাবাদি জমি পড়ে আছে। এখন যদি আশ্রমের অধ্যক্ষকে বলা হয় আপনারতো নিজেরা আশ্রমের জমিতে কিছু আনাজপাতির চাষ করে নিতে পারেন। শুনলেই তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করবেন, আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের বলছে চাষবাশ করতে! এইটাই মুর্খামি। আমার খাওয়া জুটছে না, আমার পয়সা নেই, কিন্তু প্রচুর জমি থাকা সত্ত্বেও আমি খুরপি কোদাল নিয়ে যে একটু চাষবাস করে নেব সেটাও আমার দ্বারা হবে না। এখানে এই জিনিষটাকে নিন্দা করা হচ্ছে। যে দেশে যে জিনিষটার প্রশংসা করা হয়, তার মানে ঐ দেশে ঐ জিনিষটার দুর্বলতা আছে। আমাদের দেশে কোথাও বলছে না যে অহিংসা করতে, বলছে কাজ কর। আমাদের দেশের লোকেরা এত কুঁড়ে কিছুতেই কাজ করতে চাইবে না। উপনিষদেই বলছে কাজ কর, গীতাতে বলছে কাজ কর, মহাভারতে বলছে কাজ কর, স্বামীজী বলছেন কাজ কর। কারণ কি? কারণ দেশটা হচ্ছে মহা কুঁড়ের দেশ। কাজ না করে শুয়ে বসে আয়েস করে কাটাতে চায়। এখানে এই মহা রোগের থেকে আমাদের সাবধান করা হচ্ছে। অনেক সময় শাস্ত্র চর্চা ও শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে করে আমাদের পরমার্থ জ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞানটা হয়ে যায়। তাত্ত্বিক জ্ঞানটা এসে গেলে ভেতরে একটা অহঙ্কার জন্ম নেয়, আমি অনেক কিছু জেনে গেছি, এই অহঙ্কারটাই সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানে মুক্তির সাধন হতে পারেনা। তাত্ত্বিক জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর যদি সাধন ভজন না করে, সব কাজ কর্ম বন্ধ করে লোককে কেবল জ্ঞান বিতরণ করতে থাকলে তার মহা পতন হয়ে যেতে বাধ্য। আবার অনেকে তাত্ত্বিক জ্ঞানটা বুঝেই ঠিক করে ফেলে আমি আর বেশি লোকজনের সঙ্গ না করে একা একা কোথাও নির্জনে বসে সাধন ভজন করব। রাজযোগে অহিংসা, সত্য, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য সাধনের কথা বলা হয়েছে, যে কোন সাধককেই এই গুণগুলিকে সাধনার দ্বারা অর্জন করে নিতে হয়। এখন কেউ যদি ঠিক করে আমি হিমালয়ের কোন গুহায় গিয়ে তপস্যা করব, কিন্তু তাকে যদি বলা হয় তোমার কি এই গুণগুলো, অহিংসা, সত্য, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য অর্জন করা হয়ে গেছে? যদি না হয়ে থাকে তোমাকে আগে সমাজের মধ্যে থেকে এই গুণগুলির সাধনা করতে হবে। সমাজে থাকলে যখন নানা রকমের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা হতে থাকবে তখনই মিথ্যা কথা বলার প্রলোভন আসে, ঐ প্রলোভনের মধ্যে সত্যকে সে কিভাবে ধরে রাখবে সেখানেই তার পরীক্ষা হয়ে যায়। পাকা সাধক না হয়েই যদি একান্ত বাস করতে যায় তাহলে তার সর্বনাশ হবেই হবে। কারণ শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নিয়েই সে এখন নিজেকে বিরাট সাধক মনে করছে। আমাদের বিভিন্ন উপনিষদ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদে এগুলোকে প্রচুর নিন্দা করা হয়েছে।

তুমি যদি শুধুই কাজ করে যাও তাহলেও তোমার সর্বনাশ হবেই, কারণ কাজ করলেই নানা রকমের অশান্তি, আর কাজের একটা ফল আছে। তাই কর্মের মাধ্যমে স্বর্গ বা নরকের দুটো রাস্থাই তুমি খুলে দিচ্ছ। কিন্তু তুমি যদি ব্রহ্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানটুকু নিয়েই শুধু বসে থাক তাহলে তো তোমার সব গেল, কারণ তুমিতো জ্ঞান লাভ করতে পারলে না আর অন্য দিকে তুমি কোন কর্মও করলে না, মাঝখান থেকে তুমি খালি ঘুরতেই থাকবে। অন্য দিকে তুমি দেবতাদের উপাসনাই শুধু করতে থাক, তাতেও যদি তুমি কৃতকৃত্য হয়ে যাও তখন তুমি আরও বেশি বোঁ বোঁ করে ঘুরতেই থাকবে। আমাকে যদি একটা জেলে বন্দী করে রাখা হয়, সেখানে আমাকে ডাল-রুটিই খেতে দিক আর বিরিয়ানিই খেতে দিক, জেল তো জেলই। স্বর্গটাও জেল নরকটাও জেল। এইভাবেই বিভিন্ন দিক দিয়ে এই মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ করা হয়, তা নাহলে এই মন্ত্রের অর্থ কোন ভাবেই দাঁড় করান যায় না।

উপনিষদের এই ঋষি তাঁর শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন, সেই শিষ্যকে ঋষি বলছেন, আমি তোমাকে যা বলছি এগুলো আমরা আমাদের আগের আগের যাঁরা ঋষি ছিলেন তাঁদের কাছে এই উপদেশ শুনেছি, আমি তোমাকে কিছু নিজের মনগড়া কথা বলছি না, আমরা পরম্পরাতে এটাই পেয়ে আসছি। পরের মন্ত্রে ঋষি ঠিক এই কথাই বলছেন –

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।।১০

আগের আগের ঋষিরা, যাঁরা আমাদের গুরু ছিলেন, তাঁদের কাছেই আমরা এই কর্ম ও উপাসনার ব্যাখ্যা এই রকমই শুনেছি, এই ব্যাখ্যা আমরা গুরু পরম্পরায় পেয়েছি। উপনিষদাদিতে পরম্পরার গুরুত্ব প্রচণ্ড। গুরু পরম্পরাতে আমরা

কি শুনেছি? বিদ্যার ফল এক রকম হয় আর অবিদ্যার ফল অন্য রকম হয়। অবিদ্যার তো কোন ফল হয় না, এখানে অবিদ্যা বলতে কর্মকে বোঝাচ্ছে। যারা কর্ম করে যাচ্ছে তাদের ফল এক রকম হয় আর যারা বিদ্যার উপাসনা করেন অর্থাৎ জপ-ধ্যান করেন তাদের ফল অন্য রকম হয়। কর্মীরা কর্ম করে যে স্বর্গে যাবে আর যারা দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করেছে তারা একই স্বর্গে যাবে না, এরা দুজনেই আলাদা আলাদা স্বর্গে যাবে এটা আমাদের বেদই বলছে। *ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং*, মানে যাঁরা একেবারে ধীমতাম্, অর্থাৎ সেই ঋষিদের কাছ থেকে আমরা এই রকম শুনেছি। কি রকম শুনেছি? বিদ্যার দ্বারা মানুষ দেবলোক পায় আর কর্মের দ্বারা পিতৃলোক পায়। গীতার অষ্টম অধ্যায়েও এই দুটো পথের কথা বলা হয়েছে, উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ণ, উত্তরায়ণ দেবলোকে নিয়ে যায় আর দক্ষিণায়ণ পিতৃলোকে নিয়ে যায়, এই দুটো আলাদা পথ। পিতৃলোকে নিয়ে গেলে কিছু দিন সেখানে সুখ ভোগ করার পর আবার ফেরত চলে আসে, তারপর সে আবার চেষ্টা করতে থাকবে। আর উত্তরায়ণের পথে দেবলোকে চলে গেলো সে ওখানে অনেক দিনের জন্য আটকা পড়ে গেল। অমৃতের দৃষ্টিতে দুটো লোকই নিকৃষ্ট। এই যে শ্রুতি, যুক্তি, অনুভূতির কথা বলা হয়, এটা হল শ্রুতির কথা। নয় নম্বর মন্ত্রে কোন ঋষি নিজের শিষ্যকে সাবধান করার জন্য বলছেন, বলেই সঙ্গে সঙ্গে বলছেন এটা আমরা পরম্পরাতে পেয়েছি। এখন তিনি যাঁর কাছ থেকে শুনেছিলেন তাঁকে যদি জিজ্ঞাস করা হয়, আপনি এটা কোথায় পেয়েছিলেন? তিনিও বলবেন আমি ভাই এটা পরম্পরাতে শুনেছি। এই ভাবে যেতে যেতে কোথায় গিয়ে শেষ হবে? শেষে ব্রহ্মাতে গিয়ে দাঁড়াবে। শেষে ভগবানের কাছে না গেলে কেউ মানবে না। এরপর সমুচ্চয়ের কথা বলা হচ্ছে –

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে।।১১

যখন তুমি জেনে গেলে কর্ম তোমাকে পিতৃলোকে নিয়ে যাবে আর দেবতা জ্ঞানে উপাসনা তোমাকে দেবলোকে নিয়ে যাবে, শুধু কর্মকে যদি নিয়ে চলতে থাক তাহলে অন্ধকার যাবে, শুধু যদি উপাসনাকে নিয়ে চল তাহলে আরও অন্ধকারে যাবে, তুমি তাই দুটোকে মিলিয়ে নাও। দুটোকে মিলিয়ে চললে তোমার বুদ্ধিটা আরও খুলবে, দ্বিতীয়তঃ সময়ের উপযোগিতা বেড়ে যাবে, আর তৃতীয়তঃ তোমার শরীরের যত যন্ত্র আছে, হাত, পা, মন, বুদ্ধি সবটাকেই কাজে লাগানো যাবে। *বিদ্যাং চ অবিদ্যাং*, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুটোকে *উভয়ং সহ*, একত্রে নিয়ে চল। কি রকম দুটোকে একত্রে একটার পর একটা করবে? *অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা*, তুমি যদি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম কর, স্বামীজী এই যুগের অগ্নিহোত্রাদি কর্মকে বলছেন নিঃস্বার্থপর কর্ম, স্বার্থবিহীন সেবা করলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে যায়। আচার্য এখানে বলছেন *স্বাভাবিকং কর্মজ্ঞানং চ*, মানুষ যখন সেবাদি কর্ম করে, কিংবা যজ্ঞাদি করতে থাকে, তখন সে কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের থেকে দূরে চলে যায়। অন্য দিকে এই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগই হল মৃত্যু তুল্য। বর্তমান যুগ যেমন পুরোপুরি ভোগে নেমে পড়েছে, শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এটাই হল ভোগ। এই ভোগের কি পরিণতি? কঠোপনিষদে নচিকেতা বলছেন – *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*, এরা পোকামাকড়ের মত জন্মাচ্ছে পোকামাকড়ের মত মরছে। তাহলে মৃত্যু কি? আচার্য বলছেন – স্বাভাবিক কর্মজ্ঞান, সাধারণ মানুষের যে সাধারণ জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞানে সব সময় চিৎকার করছে আমার এটা চাই, আমার সেটা চাই আর এই জ্ঞানানুসারে তারা যে ধরণের কর্ম করে বেড়াচ্ছে, এটাই হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু যে সময়টুকু পূজা, জপ, যজ্ঞ করছে তখন সে আস্তে আস্তে নিজেকে এই স্বাভাবিক জ্ঞান বশতঃ ভোগ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসছে। যেমন যখন কেউ একাদশীর উপোবাস করছে, তখন বাড়িতে যত ভালো মন্দ খাবারই আসুক না কেন, সে কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকাবে না, এখানে সে নিজেকে আটকে দিল। স্বাভাবিক কর্ম বলতে বোঝাচ্ছে জাগতিক বা সাংসারিক কর্ম, এই কর্মগুলি থেকে মানুষ অবিদ্যার উপাসনার দ্বারা নিজেকে টেনে নিয়ে এল। স্বাভাবিক কর্মকে বলা হচ্ছে মৃত্যুতুল্য, টেনে নিয়ে আসা হল মানে মৃত্যু থেকে তুমি বেরিয়ে এলে। তুমি যখন পরের জন্য কাজ করছ, পরহিতে নিজেকে উৎসর্গ দিয়ে সেবাদি কর্ম করে যাচ্ছ তখন নিজের স্বার্থপূরণটা বন্ধ হয়ে গেল। নিজের স্বার্থ পূরণে লেগে থাকাই মৃত্যু। এর উপরই স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তি পাই – They alone live who live for others, rest are more dead than alive যারা অপরের জন্য বেঁচে আছে তারাই জীবন যাপন করছে, আর যারা শুধু নিজের জন্যই বেঁচে আছে তারা মরেই আছে। ঠিক এই জিনিষটাই এখানে বলা হয়েছে – *অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা*, তুমি যখন স্বার্থ ত্যাগ করে যা করছ সেটাই সেবা কর্ম করছ, এই নিঃস্বার্থ কর্মেই তোমার যে স্বাভাবিক ভোগবৃত্তি সেটা আটকে যাচ্ছে। এই আটকে যাওয়ার জায়গাতেই স্বামীজী ঐ বিখ্যাত উক্তিটা করছেন।

নয় নম্বর মন্ত্রের সাথে এগারো নম্বর মন্ত্রকে মেলানো খুব কঠিণ। যে দেবতা সম্বন্ধীয় উপাসনা করে আর এখানে যে কর্ম করে দেবতার উপাসনা করছে, এই দুটোর ফল কেন আলাদা আর কিভাবে আলাদা হচ্ছে এটা পরিষ্কার হয় না। এখানে আচার্য সেইজন্য বলছেন – আলাদা ফল হতে পারে। কি রকম ভাবে? যারা শুধু উপাসনাই করেছে, কর্ম করেনি, তারা হয়তো সালোক্য পেয়ে যায়, কিন্তু যারা কর্ম করে উপাসনা করে তারা সারূপ্য পায়। এইটাই এইখানে বলা হচ্ছে, *বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে,* এইভাবে নিঃস্বার্থ কর্ম করে যখন দেবতাজ্ঞানে উপাসনাতে যাচ্ছে তখন মানুষ দেবত্ব ভাব পেয়ে যায়। দেবত্ব ভাব পেয়ে যাওয়ার অর্থ সেই দেবতার সারূপ্য পেয়ে যায়, আর এই অমৃত হল আপেক্ষিক। আচার্য এখানে খুব জোরের সাথে বলে দিচ্ছেন, যদিও বলছেন *বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে,* এই উপাসনার দ্বারা যে অমৃত পাওয়ার কথা বলা হচ্ছে এই অমৃত অমরত্ব নয়, এখানে অমৃত আপেক্ষিক। বাকিদের তুলনায় সে অনেক বেশি দিন থাকবে। কারণ দেবতার ভাব সে পেয়ে গেল, ওই দেবতা যত দিন থাকবেন সেও তত দিন থাকবে। কিন্তু এভাবে বলার পরও নয় নম্বর আর এগারো নম্বরে একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। সে যদি দেবতার ভাব পেয়েও যায় সে কিন্তু অত দিন আটকে থাকবে। সেইজন্য পরের দিকে চিন্তাধারার পরিবর্তনে বলা হল, না সে আটকে থাকবে না। যে কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি করল, চিত্তশুদ্ধি করে সে তার ইষ্টের উপাসনাতে লেগে গেল। এবার সে ইষ্টের সারূপ্য পেয়ে যাবে। যেমন কেউ কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি করার পর ঠাকুরের উপাসনা করতে থাকল, এখান থেকে সে ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে যাবে। এবার যদি ঠাকুর তাকে না দেখিয়ে দেন – এই দ্যাখ্ আমার অখণ্ড রূপ, এটা হলো সাযুজ্য, এখানেই কিন্তু সে প্রকৃত এক হয়ে যাবে, সারূপ্যে কিন্তু এক হচ্ছে না, ভেদ থেকে যাচ্ছে। সারূপ্যের বেলায় যে ইষ্ট দেবতার উপাসনা করে সে ঐ দেবতার সারূপ্য পেয়ে গেল, বৈষ্ণবদের মতে যখন শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য পেয়ে যাবে, এবার যখন এই সৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে, তখন হিরণ্যগর্ভে ঈশ্বরের সঙ্গে বিলীন হয়ে যান, তখন এরও মুক্তি হয়ে যাবে। এই সৃষ্টি যত দিন থাকবে তত দিন তাকে আটকে থাকতে হবে। এই যত কথা বলা হল এগুলো বিভিন্ন মত। কিন্তু যেটা পরিষ্কার তা হল, কর্ম তুমি করবে, মানে যজ্ঞাদি কর্ম আর তার সঙ্গে উপাসনাদিও করবে।

এর উপরে আবার গীতাতেও প্রচুর বিতর্ক আসবে, সেখানে বলবে তাহলে তো কারুরই কর্ম ছাড়া উচিৎ নয়, কর্মসন্ন্যাস তাহলে কারুরই হবে না। তা নয়, এই মন্ত্র সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। গৃহস্থদের জন্য মূল কথা হল, শুধু তুমি যদি দেবতাদির উপাসনা কর তাহলে তুমি কিন্তু ফেঁসে যাবে। কেন ফাঁসবে? তোমার মনে অহঙ্কার এসে যাবে, অহঙ্কার এসে গেলে তুমি আর এগোতে পারবে না। যদি তুমি এগিয়েও যাও তাহলে তুমি খুব মেরে কেটে সালোক্য পাবে। সাযুজ্য তোমার হবে না, সাযুজ্য হবে একমাত্র পরমাত্ম জ্ঞানে, যখন তুমি ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁকে সাধনা করবে। কিন্তু যখন কর্মাদি করে দেবতাদের উপাসনা করবে তখন তোমার সারূপ্য হয়ে যাবে। সারূপ্য হয়ে গেলে তুমি সৃষ্টি যত দিন চলতে থাকবে তত দিন তুমিও পড়ে থাকবে, এই সৃষ্টি যখন লয় হবে তখন তোমারও মুক্তি হয়ে যাবে, বাকিরা আবার নতুন সৃষ্টির সময় ফেরত চলে আসবে।

দেবত্ব ভাব পাওয়া অনেক উঁচুর ব্যাপার, তখন তাকে আর স্বর্গের বাসিন্দা হতে হচ্ছে না, দেবত্ব ভাব এসে গেল মানুষের চেতনা অনেক বেড়ে যায়। চেতনাটুকু থেকে যায় বলে আবার যখন সে ফিরে আসবে তখন এই চেতনাই তাকে মুক্তির দিকে ঠেলে দেবে। নয়, দশ আর এগারো এই কটি মন্ত্রের সার বক্তব্য হচ্ছে তুমি যজ্ঞাদি কর্ম অবশ্যই করবে আর যজ্ঞাদি কর্মের বাইরে যে উপাসনা মানে জপ-ধ্যান অবশ্যই করবে। এটা কিন্তু বৈদিক কালের কথা। আমাদের এই যুগে এই মন্ত্রের তাৎপর্য স্বামীজী যেটা সমন্বয়ের বা সমুচ্চয়ের কথা বলেছেন, সবটাকে নিয়েই চলতে হবে, কাজও করবে আবার জপ-ধ্যানও করবে।

ঠাকুর যে এক হাতে কর্ম করতে আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে রাখার কথা বলছেন, সেটা আরও উচ্চ অবস্থার কথা। মনে ঈশ্বরের ভক্তি ভাবকে দৃঢ় রেখে এটা তাঁরই সংসার এই ভাব নিয়ে সব কাজ করার কথা বলছেন। এই ভাবটাকে সাধনা হিসাবেও নেওয়া যেতে পার, তবে উপনিষদে এখানে যে সাধনার কথা বলা হচ্ছে এটা আরেকটু নীচের দিকের সাধনার অবস্থার কথা বলছেন। ঠাকুর এও বলছেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সব কাজ কর। অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধা মানে অদ্বৈতের ঐ অভেদ ভাবটাকে নিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে, এটা আরও অনেক উচ্চ অবস্থার কথা বলছেন। উপনিষদে এখানে শুধু জপ-ধ্যানের সাধনার স্তরের কথাই বলা হচ্ছে।

১৮/১২/২০১০

এর আগেও বলা হয়েছিল যে, বেদে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, একটা জিনিষকে বেদ করতে বলছে, আবার বেদেরই অন্য জায়গায় সেই জিনিষটাকে নিন্দা করা হচ্ছে। সব থেকে ভালো উদাহরণ হচ্ছে বেদের এক জায়গায় বলছে যজ্ঞের সময় বলি দেবে, আবার একটা জায়গায় আছে হিংসা কর্ম করবে না। যে বেদকে বলা হচ্ছে অপৌরুষেয়, বেদ যা বলছে সেটাই হবে, বেদের কথাই শেষ কথা। কিন্তু বেদ এক জায়গায় বলছে যজ্ঞে বলি দেবে আর তারপরেই অন্য জায়গায় বলছে হিংসা করবে না। তার মানে দুটো বিপরীত কথা হয়ে গেল। কিন্তু যখনই বেদে কোন বিধির উপর কোন বিপরীত কথা আসে, এক জায়গায় বলছে এই রকমটি করবে, অন্য জায়গায় বলছে এই রকমটি করবে না, তখন বুঝতে হবে অন্য কোন জিনিষকে স্তুতি করার জন্য এই রকম বিপরীত কথা বলা হয়েছে। এর আগের তিনটি মন্ত্র ঠিক এই অর্থেই বলা হয়েছে। এর পরের তিনটি মন্ত্রও ঠিক এই ভাবটাকেই নিয়ে আসছে। বারো নম্বর মন্ত্রে এসে বলছেন –

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভুতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভুত্যাং রতাঃ।।১২

একেই ঈশাবাস্যোপনিষদ খুব প্রাচীন, তার ওপর এর অনেক শব্দ এখন হারিয়ে গেছে, এই ধরণের শব্দের ব্যবহার এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে এমন কিছু চিন্তা ভাবনাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সেই চিন্তা ভাবনাগুলোও এখন হারিয়ে গেছে। আচার্য শঙ্কর যদিও এই উপনিষদের ভাষ্য রচনার মধ্যে এর শব্দের অর্থগুলোকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই ছটি মন্ত্রের অর্থ বিশেষ করে আজকের দিনে কি হবে এটা খুব একটা পরিষ্কার হয় না। আজ থেকে প্রায় চার পাঁচ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বজদের মাথায় এই ধরণের চিন্তা ভাবনা ছিল, কিন্তু আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে এই ভাবনা চিন্তাগুলি ঠিক কেমনটি হবে সেটা আমাদের কারুর কাছেই পরিষ্কার নয়।

বারো নম্বর মন্ত্রের ভাব আর নয় নম্বর মন্ত্রের ভাব একই। বারো নম্বর মন্ত্রে ব্যক্ত আর অব্যক্তের উপাসনার কথা বলা হচ্ছে। এখানে যে অব্যক্তের উপাসনার কথা বলা হচ্ছে, অনেক দিন আগেই এই অব্যক্তের উপাসনা বন্ধ হয়ে গেছে। তার মধ্যে যে দুটি শব্দ ঈশাবাস্যোপনিষদ ব্যবহার করছেন সেটা হচ্ছে অসম্ভুতি আর সম্ভূতি, এই দুটি শব্দও এখন খুব জটিল হয়ে গেছে। তবে অসম্ভুতির অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি যেখান থেকে সম্ভব হয়, তার মানে যিনি সম্ভব হয়েছেন বা যিনি প্রকাশিত হয়েছেন। প্রকৃতি থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে, তাই এখানে অসম্ভুতির মূল অর্থ প্রকৃতি। এখানে প্রকৃতি হচ্ছেন, যিনি পরের দিকে তন্ত্র দর্শনে মা কালী বা মা দুর্গা হয়েছেন, আবার সাংখ্যে যাঁকে প্রকৃতি বলা হচ্ছে সেই প্রকৃতি। প্রকৃতি বলতে তখনকার দিনে বোঝাত ঈশ্বরের শক্তি, কিন্তু ঈশ্বর বলতে আজকে আমরা যা ধারণা করছি ঈশাবাস্যোপনিষদের সময় এই ধারণা ছিল না, বেদেও এই অর্থে ঈশ্বরের ধারণা ছিল না, বেদে ঈশ্বরের বদলে পুরুষ বলা হত, পুরুষ হচ্ছে চৈতন্য, যিনি চৈতন্য তিনি পুরুষ। এবার তাহলে সম্ভুতির কি অর্থ বোঝাচ্ছে? চৈতন্য থেকে তো জড়ের সত্তা আসতে পারেনা, তাহলে জড়ের ঐ সত্তা কোথা থেকে আসছে, যেখান থেকেই আসুক না কেন, একটা কিছু তো তার উৎস হবে? সেই উৎসকে এনারা বলছেন প্রকৃতি। চৈতন্য সত্তাকে যখন প্রকৃতির মাঝখান দিয়ে দেখা হয় চৈতন্যকে তখন অন্য রকম দেখায়। আলো আছে আলোর সামনে কতকগুলি পর্দা আছে, এখন পর্দাগুলি সরিয়ে দিলে আলো এক রকম দেখাবে আবার পর্দার ভেতরে দিয়ে দেখলে আলোটা অন্য রকম দেখাবে। যিনি ঈশ্বর, তাঁর উপর যখন পর্দার আবরণ দেওয়া হল, আর ঐ পর্দার ভেতর দিয়ে যে ঈশ্বরকে দেখা যাচ্ছে সেই ঈশ্বরকে এনারা নাম দিলেন সম্ভুতি। সম্ভুতি বলতে বেদান্তে হিরণ্যগর্ভকে বোঝাচ্ছে। এটা কিন্তু আচার্য শঙ্করের নিরূপিত অর্থ। তখনকার দিনে সম্ভুতির ঠিক ঠিক কি অর্থ ছিল এখন আমরা কেউই বলতে পারবো না।

এই ছটি মন্ত্র থেকে আমরা চারটে জিনিষ পাচ্ছি। প্রথম যে জিনিষটা পাচ্ছি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা প্রচুর কর্মকাণ্ড করতেন। যার জন্য শুক্লযজুর্বেদের সংহিতা অংশেই ঈশাবাস্যোপনিষদ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এটা বোঝা যাচ্ছে যে সেই সময়ে অনেকেই ছিলেন যাঁরা দেবতার উপাসনা করতেন, আমাদের আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি প্রচুর জপ-ধ্যান করতেন। নবম মন্ত্রে বলেছিলেন, যারা কর্ম করে তারা অন্ধকারে যায়, আর যারা দেবতাদের উপাসনা করছে তারা

আরও বেশি অন্ধকারে যায়। তাহলে এদের উপাসনা কে করতে বলেছিল? বেদই বলেছে কর্ম করতে আবার বেদই বলেছে উপাসনা করতে। সেই বেদই আবার বলছে যারা কর্মকাণ্ড করে তারা মৃত্যুর পর অন্ধকারে যায় আর যারা উপাসনা করে তারা আরও বেশি অন্ধকারে যায়। এখানেই সমুচ্চয় করা হচ্ছে, যখন কর্ম করবে তখন উপাসনাও করবে, যদি উপাসনা কর তার সাথে কর্মটাও করবে। ঠিক এই রকমই আমরা তখনকার দিনে দুই ধরণের লোক পাই, একজন যারা ছিল তারা প্রকৃতির উপাসনা করত, যেটাকে বলা হচ্ছে অসম্ভূতি। তার সাথে আরেক ধরণের লোক ছিল যারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করতেন। আজকের দিনে যাঁকে ব্রহ্মা বলা হচ্ছে। এখানে যে অর্থে হিরণ্যগর্ভোপসাক বলা হচ্ছে সেই অর্থে আর কেউ হিরণ্যগর্ভোপসাক হয় না, বিশেষ করে আচার্য শঙ্কর আসার পর সারা দেশ ঈশ্বরোপসাক হয়ে গেছে। হয় ঈশ্বরোপসাক আর তা নাহলে শীতলা মা, বিশালাক্ষী মা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানীয় দেব-দেবীর উপাসনা করে। কিন্তু সেই ভাবে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা বন্ধই হয়ে গেছে, আর হিরণ্যগর্ভের বদলে যদি ব্রহ্মাকে নিয়ে আসা হয় তাহলে তো বলতেই হয় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে, সারা ভারতে পুষ্কর ছাড়া ব্রহ্মার পূজো আর কোথাও হয় না। কিন্তু যত দূর জানা যায় বেদের সময় ব্রহ্মার পূজো ছিল, এই কথা গুলো আমরা অনুমানের উপরে বলে যাচ্ছি কারণ ঈশাবাস্যোপনিষদ এতো পুরনো হয়ে গেছে যে এখন আমাদের কাছে এর কোন প্রামাণিক তথ্য নেই।

যে অসম্ভূতির উপাসনা করে, অসম্ভূতি মানে প্রকৃতি বা অবিদ্যা, তিনি অন্ধকারে গিয়ে পড়ে। কেন অন্ধকারে গিয়ে পড়ে? অবিদ্যা হচ্ছে যত রকমের কাম বাসনার বীজ, কারণ অবিদ্যাই হচ্ছে সব কিছুর মা। অবিদ্যার উপাসনা করলে নানান রকমের ক্ষমতা চলে আসে। অবিদ্যা বা মায়া বা শক্তির উপাসনা করলে নানান ধরণের সিদ্ধাই এসে যায়। সিদ্ধাই যার মধ্যে এসে যায় সে কিন্তু আর এগোতে পারেনা। সিদ্ধাইকে অর্জন করার কথা কে বলে রেখেছে? সিদ্ধাইকে পাওয়ার কথা বেদই বলে রেখেছে। কিন্তু এখানে এসে বলছেন তুমি যদি শুধুই অবিদ্যার উপাসনা কর তাহলে তুমি অন্ধকারে যাবে আর তুমি যদি হিরণ্যগর্ভের উপাসনা কর তাহলে তুমি আরও অন্ধকারে গিয়ে পড়বে। কারণ হিরণ্যগর্ভ হচ্ছে কার্য ব্রহ্ম, কার্য ব্রহ্ম বলতে বোঝায়, এই যে সৃষ্টি হয়েছে আর যে সৃষ্টিকে আমার সামনে দেখা যাচ্ছে একেই কার্য ব্রহ্ম বলা হচ্ছে। এই হিরণ্যগর্ভের যদি উপাসনা করো তাহলে আরও অন্ধকারে যাবে, কিন্তু শক্তির উপাসনা করলে কম অন্ধকারে যাবে। এই বক্তব্যের খুব সার্থক উপমা যদি দেওয়া হয় তাহলে বলা যায়, তুমি যদি বিজ্ঞানের উপাসনা কর তাহলে তুমি গভীর অন্ধকারে যাবে, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে কার্য ব্রহ্ম। আর শক্তির যদি উপাসন কর তাহলে কম অন্ধকারে যাবে, কিন্তু অন্ধকারেই যাবে। এখানে বলছেন কার্য ব্রহ্ম আর কারণ ব্রহ্ম, কিন্তু ঈশাবাস্যপোনিষদের সময়কার যে ভাবগুলি ছিল সেগুলো এখনকার দিনে এসে পাল্টে গেছে।

ঈশাবাস্যপোনিষদের প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, একজন মহান ঋষি আছেন, তাঁর খুব খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। ঋষির কাছে দুজন অল্প বয়সী ব্রহ্মচারী এসেছে উপনিষদের শিক্ষা নিতে। তাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি বলছেন, তুমি যদি কারণ ব্রহ্মের উপাসনা কর তাহলে তুমি অন্ধকার যাবে, কারণ ব্রহ্ম মানে যেখান থেকে সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, মানে অবিদ্যা, মানে মায়া, আমাদের ভাষায় মা কালী, তবে মা কালীর যে বর্ণনা আর অবিদ্যার যে ভাব তার সাথে কিছু পার্থক্য আছে, বেদান্তে যাকে অবিদ্যা বলা হচ্ছে তন্ত্রে তিনি কিন্তু মা কালী নন, কাছাকাছি কিন্তু একটু তফাৎ আছে। অথচ কারণ ব্রহ্মের উপাসনা করার আদেশ বেদই দিয়েছে আর অন্য দিকে তুমি যদি কার্য ব্রহ্মের উপাসনা কর তাহলে তার থেকেও বেশি অন্ধকারে যাবে।

তাহলে উপাসনা তিন রকমের হয়ে গেল। এর আগের মন্ত্রে বলা হয়েছে দেবতা সম্বন্ধীয় উপাসনা, দেবতা সম্বন্ধীয় মানে, ইন্দ্র, আদিত্য, বরণ এই সব দেবতার উপাসনা। দেবতা সম্বন্ধীয়ের উপরে হচ্ছে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা, হিরণ্যগর্ভের উপরে হচ্ছে অবিদ্যার উপাসনা, এই তিনটে উপাসনার কথা এখানে বলছেন। ঈশাবাস্যোপনিষদ যখন অধ্যয়ণ করছি তখন এই উপনিষদে তিন ধরণের উপাসনা পাওয়া যাচ্ছে আর চতুর্থ হচ্ছে কেবল কর্মকাণ্ড। ঈশাবাস্যোপনিষদ বলছেন তুমি যদি এই তিনটে উপাসনা আর কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে কোন একটাকেই করতে থাক তাহলে তুমি অন্ধকারে যাবে। আর স্তুতি করার জন্য বলছেন, তুমি যদি অন্যটা কর তাহলে তুমি আরও বেশি অন্ধকারে যাবে। তাহলে মানুষ করবেটা কি? সেইজন্য সমুচ্চয়ের কথা বলা হল, তুমি এটাও করবে ওটাও করবে। কিন্তু দুটোই যদি অন্ধকারে নিয়ে যায় তাহলে তো দুটোকেই ছেড়ে দেওয়া দরকার। আমি আপনার কাছে গেলে আমাকে দুটো ঘুষি মারবেন, আর আপনার দাদার কাছে গেলে তিনি আমাকে তিনটে ঘুষি মারবেন, এখন আমি কার কাছে যাব? স্বাভাবিক ভাবেই আমি কারুর কাছেই যাবো না, কেন আমি

ঘুষি খেতে যাব! কিন্তু তারপরের মন্ত্রে বলছেন তুমি এটাও করবে ওটাও করবে তাহলে তুমি উদ্ধার হয়ে যাবে। যাই বলা হোক না কেন তুমি উদ্ধার পেয়ে যাবে, গোড়াতে এই দুটোর মধ্যে একটা বৈপরিত্য এসে যাচ্ছে। আসলে এটাই হল উপনিষদ শিক্ষা দেওয়ার একটা চিরাচরিত কৌশল। বিপরীত ভাব এনে একটা তৃতীয় ভাবকে নিয়ে তার প্রশংসা করা হচ্ছে। আপনি আমাকে দুই ঘুষি মারবেন, আপনার দাদা আমাকে তিন ঘুষি মারবে, এবার আমাকে বলে দিল, তুমি দুজনকেই ধর। তাহলে তো দুই আর তিন মিলে পাঁচটা ঘুষি আমার উপর পড়বে। না, তা হবে না, এতে তোমার উন্নতি ভালো হবে। কিন্তু এর পেছনে কোন জোড়ালো যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, কোন্ যুক্তিতে আমি বলব যে দুজনকে ধরলে আমার উন্নতি ভালো হবে? কিন্তু বেদে প্রচলিত একটা তত্ত্ব যে, বেদে যখনই একটা কিছু বলে তারপর তার নিন্দা করা হয়, তার অর্থই হচ্ছে অন্য কোন জিনিষের স্তুতি করা হচ্ছে। বেদ দুটোর কোনটাকেই বাদ দিয়ে দিতে বলবে না, একজকে স্তুতি করার জন্য আরেকজনকে ছোট করা হচ্ছে, তার মানে এই নয় যে সে ছোট। একটা উদাহরণ দিয়ে বললে জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বাড়িতে দুই ভাই আছে, দুজনেই বাচ্চা, একজনের তিন বছর বয়স আরেকজন পাঁচ বছরের। ছোটটা একটু বেশি আদরের, বড়টাও আদরের কিন্তু ছোটটা ছোট বলে একটু বেশি আদুরে। ছোটটাকে আদর করতে গিয়ে আমি বলতে পারি, তুমি দাদার থেকে অনেক ভালো। আবার অন্য ভাবে বলা যায়, তোমার দাদা কিছুই না। তাহলেও কিন্তু ছোটটার প্রশংসা করা হল। কিন্তু তাই বলে কি বড়টিকে আমি ফেলে দিতে চাইছি? আদপেই না। একজনকে স্তুতি করার জন্য আরেকজনকে ছোট করে দেওয়া হয়। তার মানে এই নয় যে সে ছোট, সেও ফেলনা নয়, কারণ সেও আমারই ছেলে। বেদেই আগে চারটে জিনিষকে করতে বলছে, কর্মকাণ্ড, তুমি যজ্ঞাদি করবে, বলি দেবে ইত্যাদি, তারপরে বলছেন দেবতা বিষয়ক উপাসনা করতে, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণাদির উপাসনা করতে, তৃতীয় বলছে কার্য ব্রহ্মের উপাসনা করতে, মানে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করতে, আর চতুর্থতঃ বলছেন কারণ ব্রহ্মের উপাসনা করতে, কারণ ব্রহ্ম হল প্রকৃতি বা অবিদ্যার উপাসনা, এখন যাকে বলা হচ্ছে মাতৃশক্তির উপাসনা। এই সব ধরণের উপাসকরা হাজার চারেক বছর আগেও ছিলেন।

এবারে এই ছটি মন্ত্রের উপর একটা অন্য ধরণের ব্যাখ্যাকে নিয়ে এসে ঋষিদের ভাবকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ব্যাখ্যাতেও ভুল থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যত শাস্ত্রই ঘাটাঘাটি করিনা কেন, কোথাও এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। যত বড় বড় ভাষ্যকাররা আছেন সবাই হাত তুলে বলে দিয়েছেন এই মন্ত্রগুলির অর্থ স্পষ্ট নয়, কারণ এর শব্দের যথার্থ অর্থগুলি এখন হারিয়ে গেছে। ফিজিক্সে Uncertainity Principle নামে একটা থিয়োরি আছে, যাতে বলা হয় একটা জিনিষের এটাও হতে পারে ওটাও হতে পারে। এখন ধরা যাক সবার মন থেকে ফিজিক্সের সব কিছু উড়ে গেছে, তারপরই দেখতে পেল এই Uncertainity Principle, যেখানে বলছে দুই যোগ দুই চার হতেও পারে নাও হতে পারে, এটা কি রকম উদ্ভুটে ব্যাপার! নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমাল আছে। তখন বলবে, এই থিয়োরি এমন জায়গা থেকে এসেছে যে, এটা কখনই ভুল হতে পারেনা। এবার সবাই কি করবে? এখন যে যার বুদ্ধি লাগিয়ে নিজের মত একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবে। দুই গুণ দুই সব সময় চার হবে এটাই সবাই জানে, এ্যলজেব্রাতে বলে a x b = b x a। কিন্তু গণিতে Matrix নামে একটা শাখা আছে, সেখানে বলবে a x b may be equal to b x a and may not be b x a। অথচ গণিতের এই Matrix থিয়োরি ১৯৩০ সালের কাছাকাছি বেরিয়েছে। আর এই Matrix থিয়োরি না আসা পর্যন্ত আইজেনবার্গের নামকার Uncertainity Principle, আসতেই পারছিল না। তিনি দশ বছর তাঁর এই বিজ্ঞানের থিয়োরিকে চেপে রেখে ছিলেন, তার কারণ বলছেন ওনার এই থিয়োরি অনুযায়ী a x b may be or may not be b x a, এটা শুনে সবাই বলছে তা কি করে সম্ভব, দুই গুণ তিন সমান তিন গুণ তিন কি করে হবে, হতেই পারেনা। তিনি ফিজিক্সের যে থিয়োরি বার করলেন সেটাকে দশটি বছর চেপে রেখে দিলেন, সামনে আসতেই দিলেন না। তারপর কোন সেমিনারে বা পত্রিকায় এই Matrix থিয়োরির ওপর শুনলেন। যেখানে বলা হচ্ছে a x b may be or may not be b x a সেইজন্য সাধারণতঃ বলা হয় a x b is not equal to b x a এখন তো দশ এগারো ক্লাশেই এই Matrix থিয়োরি পড়ান হচ্ছে। তখন তিনি তাঁর Uncertainity Principleকে ছাড়লেন। বেরোতেই সারা বিশ্বে এই নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও এই Uncertainity Principleকে ধাক্কাই মেরে গেলেন, এটা হতেই পারেনা। আইনস্টাইন মৃত্যুর সময় এসে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, আমার এটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

এখন মনে করা যাক বিজ্ঞানের যত বই আছে সব ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু একটা চটি বই থেকে গেল, যেটাতে নিউটনের লজ অফ গ্রাভিটেশান, আইনস্টাইনের থিয়োরি অফ রিলেটিভিতি আর আইজেনবার্গের Uncertainity Principle থেকে গেল। প্রথম দুটোতে সবাই বুঝে নেবে $Force = g \times m \times m/r^2$, এটাতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর আইনস্টাইনেরে $E=MC^2$ও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আইজেনবার্গের Uncertainity Principle, যেখানে বলা হচ্ছে a x b is not equal to b x a একি করে হবে! এখানে আর সে কিছুতেই মেলাতে পারবে না। কিন্তু আমাদের এখানে বলবে আমাদের পূর্বজরা এটাকে আগে থেকেই জানতেন আর তাঁরা এটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, সেইজন্য Uncertainity Principle কে ঠিক হতেই হবে। ঈশাবাস্যোপিনষদের এই কটি মন্ত্রও বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এটা ঠিক কিন্তু অর্থগুলোকে মেলানো যাচ্ছে না। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে নিজের মত করে বলে চলে গেছেন, কিন্তু কেন এটা এই রকম হচ্ছে এই ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি। তাঁর পরের ভাষ্যকররা খুব সততার সাথে বলে দিয়েছেন যে এটা আমাদের কাছেও পরিষ্কার নয় কি বলতে চাইছে। তাঁদের শুধু বক্তব্য হচ্ছে, তখনকার দিনে এই ধরণের সাধকরা ছিলেন, তাঁরা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করত। আমাদের সময়ে যেমন হিন্দু, খ্রীশ্চান, মুসলমানরা সবাই মারামারি করছে, ঠাকুর এসে সব মতের একটা সমন্বয় করলেন। এখানেও ঠিক ঐ জিনিষটাকে সমন্বয় করে দেওয়া হচ্ছে। এখানে শুধু সমন্বয়ই করা হচ্ছে না, তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে সমুচ্চয় করা হচ্ছে। তুমি এটাও করবে আবার ওটাও করবে, তুমি কার্য ব্রহ্মের উপাসনাও করবে আর তার সঙ্গে কারণ ব্রহ্মের উপাসনাও করবে। কর্মকাণ্ডও করবে আবার তার সঙ্গে দেবতা বিষয়ক উপাসনাও করবে। এইভাবে যদি না কর তাহলে কিন্তু তুমি মরবে। তার মানে তুমি যদি হিন্দু হয়ে থাক তাহলে তোমাকে মুসলমান ধর্মকেও মানতে হবে, যদি না মান তাহলে তুমি মরবে। কেন মরবে? কারণ ভারত একটা ধর্ম নিরেপক্ষতার ভাবকে সামনে রেখে রাষ্ট্র গঠন করেছে, তুমি যদি হিন্দু হয়ে মুসলমান ধর্মকে না মান বা মুসলমান হয়ে হিন্দুধর্মকে না মান তাহলে ভারতের ধর্ম নিরেপক্ষতার ভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই অর্থেরও একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এটাতো গেল সামাজিকতার নিরিখে ব্যাখ্যা, কিন্তু এই মন্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ঠিক কি হবে এটা ততটা পরিষ্কার নেই। অনেকেই বলছেন যে, যারা কারণ ব্রহ্মের উপাসনা করে তারা এই ধরণের সিদ্ধাই পায়, যারা কার্য ব্রহ্মের উপাসনা করে তারা এই ধরণের সিদ্ধাই পায়, এই সব সিদ্ধাই তাদের এতেই আটকে রাখবে, মুক্তির সাধনা আর করতে পারবে না। আবার যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে যায়, প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে যাওয়া মানেও এক প্রকার আবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মূল কথা হল, এখানে সমুচ্চয় প্রশংসার করার জন্য বলা হচ্ছে এটা করলে ডুববে, ওটা করলে আরও বেশি করে ডুববে, যদিও এগুলো তখনকার দিনের নির্ধারিত ও পুরোপুরি অনুমোদিত সাধনার পদ্ধতি। পরের মন্ত্রে বলছেন –

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।।১২

সেই মহান ঋষি তাঁর শিষ্যদের বলছেন, আমরা পরম্পরায় শুনে আসছি। তার মানে ঈশাবাস্যোপনিষদকে যিনি সঙ্কলিত করছেন এটা তাঁর কথা নয়, পরম্পরাতে তাঁর বড় বড় আচার্য গুরুরা তাঁর কাছে *বিচচক্ষিরে*, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে – *অন্যদেবাহঃ সম্ভবাৎ*, কার্য ব্রহ্মের ফল এক রকম হয় আর *অসম্ভবাৎ অন্যৎ এব*, কারণ ব্রহ্মের ফল অন্য রকম হয়। অর্থাৎ, হিরণ্যগর্ভের যারা উপাসনা করেন তাঁরা এক রকমের ফল পান, যাঁরা প্রকৃতির উপাসনা করেন তাঁরা আরেক রকম ফল পান। আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন যে, পৌরানিকরা বলেন, এখানে পৌরানিক বলতে ভাগবদ পুরানাদির পণ্ডিতদের কথা বলা হচ্ছে না, যাঁরা অতি প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ, যাঁরা প্রাচীন কালের ভাব ও মত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁরা বলেন যাঁরা অবিদ্যার উপাসনা করেন তাঁরা প্রকৃতিলীন পুরুষ হন।

যে কোন ধর্মে চারটি স্তম্ভ থাকতে হবে, প্রথম হচ্ছে দর্শন, দ্বিতীয় পুরান, তৃতীয় পূজা উপাচার বা তন্ত্র আর চতুর্থ স্তম্ভ সামাজিক রীতিনীতি যাকে স্মৃতি বলা হয়। স্মৃতিতে বলা হয় একজন হিন্দু কি রকম আচরণ করবে, একজন মুসলমানের আচরণ কি রকম হবে, এই দুজনেরই আচরণ বিধি পুরো আলাদা। সেই রকম হিন্দুদের দর্শন, পৌরানিক কাহিনী আর পূজা উপাচার মুসলমানদের থেকে পুরোপুরি আলাদা। যেমন হিন্দুদের সকালে স্নান করে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার

কথা, মুসলমানদের দিনে পাঁচ বার নমাজ পড়লেই হবে। হিন্দুদের আবার দিনে তিনবার গায়ত্রিমন্ত্র জপ করলে অনেক হয়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে মুসলমানদের দিনে পাঁচ বার নমাজ পড়তে হব, সব কিছুই আলাদা। প্রত্যেকটি ধর্মেকে দাঁড়াতে গেলে এই চারটি স্তম্ভকে দরকার। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই চারটি স্তম্ভের দর্শন আসে উপনিষদ থেকে, পৌরানিক কাহিনী পাচ্ছি পুরানাদি শাস্ত্রে, সামাজিক আচরণ বিধি আসছে মনুস্মৃতি ও অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্র থেকে এবং পূজা উপাচার আসে কিছুটা তন্ত্র শাস্ত্র থেকে কিছুটা পুরান থেকে। সমস্ত বেদে আমরা মোটামুটি এই চারটে জিনিষকেই পেয়ে যাই। কিন্তু যখন বেদের প্রকাশ হতে থাকল অর্থাৎ যখন ধীরে ধীরে ঋষিরা তাঁদের শিষ্যদের বেদের কথা বলতে শুরু করেছেন তখন সেই সময়ে সাধারণ লোকেদের মধ্যে আচার আচরণ আগে থাকতেই ছিল, এই নয় যে বেদ আসার পর তারা তাদের আচার আচরণকে তৈরী করেছেন। সামাজিক আচার আচরণের বিধি চিরদিনই ছিল। ঠিক তেমনি তন্ত্র উপাসনা চিরদিনই ছিল আর কথা ও কাহিনী বলার যে পদ্ধতি সেটাও চিরদিনই ছিল। বেদ থেকেই যে এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তা নয়। বেদের পাশাপাশি এগুলোও সমান ভাবেই চলে আসছিল। পরের দিকে সব কিছুকে সংগ্রহ করে একটার মধ্যে সংগঠিত রূপ দেওয়া হয়েছে। পৌরানিক যাঁরা ছিলেন, যাঁরা কথা কাহিনী করতেন, যেমন শিব মহাপুরান আছে, শিব মহাপুরানে যত কাহিনী আছে এগুলো একজন বসে লেখেননি, যদিও বলা হয় ব্যাসদেব পুরান রচনা করেছিলেন। আসলে ঘটনা ঠিক তা নয়, পুরানে এখন যে কাহিনীটা আছে যেটা আগেকার দিনে লোকেদের মধ্যে ভালোই প্রচলিত ছিল, সেখান থেকে পরের দিকে লোকেরা সেই কাহিনীর মধ্যে আরও কিছু যোগ করেছেন। পরের দিকে কোন একজন বড় ঋষি এসে সব কটা কাহিনীকে সংকলন করে সমন্বয় করে দিয়েছেন। পৌরানিকদের মতের সাথে বেদের মতে একটু তফাৎ ধরা পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা যে মত পাই তাতে দেখা যায় উপনিষদের যে মত সেই মতটাই এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিয়ে উপনিষদের মতের সাথে ভাগবতের মতের সমন্বয় করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ পুরানের মত হচ্ছে সাংখ্যবাদীদের মত বা যারা যোগী তাদের মত।

সাংখ্যবাদীদের মত ছিল যখন কেউ অবিদ্যা বা প্রকৃতির উপাসনা করতে থাকে, সেখান থেকে সে সব থেকে উচ্চাবস্থা প্রকৃতিলীন পুরুষ হতে পারবে, সে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যায়। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতির যে সত্তা, এই সত্তা কিন্তু ব্রহ্ম নয়, সেই সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যায়, যদি তার জ্ঞানপ্রাপ্তি না হয়ে থাকে। যারা কার্য ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাদের শেষ উচ্চাবস্থা এদের থেকে এক ধাপ নীচে হবে। সে খুব হলে মনু হবে বা প্রজাপতি হয়ে যাবে। প্রকৃতিলীন পুরুষই হোক আর প্রজাপতিই হোক মুক্তি কিন্তু তার হচ্ছে না। অবশ্য এখানে মুক্তি নিয়ে আলোচনাও চলছে না। বেদের সংহিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে যজ্ঞ করাতে প্রবৃত্ত করানো। যজ্ঞ করলে কি হবে? ইহলোকে প্রাচুর্য আর পরলোকে স্বর্গ। স্বর্গের আবার অনেক ধাপ আছে, স্বর্গে যেতে যেতে সে কতদূর যেতে পারবে? বেদে ব্রহ্মলোক বলা হয় না, পুরানের ব্রহ্মলোক বেদের সময় ছিল হিরণ্যগর্ভের উপাসনা। তখনকার দিনে ব্রহ্মলোকের উপরে আরেকটা অবস্থা হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া। লীলাপ্রসঙ্গে প্রকৃতিলীন অবস্থার খুব সুন্দর বর্ণনা পাই। যিনি প্রকৃতিলীন হয়ে যান তিনি জগতের কোন কিছুতে আর নিজেকে জড়ান না। অন্য দিকে পুরানের মতে যিনি ব্রহ্মালোকে থাকেন তিনি ব্রহ্মার মত ক্ষমতাবান হয়ে যান। এগুলো হচ্ছে স্বর্গেরই বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা। মুনি ঋষিরা এই ধরণের অনেক কিছুর বর্ণনা দিয়ে গেছেন, আমাদের পক্ষে এগুলো ঠিক ঠিক বোঝা বা ধারণা করা সম্ভব নয়, তবে এগুলো সবই বিভিন্ন স্বর্গের বর্ণনা। আচার্য শঙ্কর যখন ভাষ্য দিতে শুরু করলেন এবং আজকে হিন্দুধর্ম যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে এটা আচার্য শঙ্করের ভাষ্যানুসারেই দাঁড়িয়েছে, আচার্য যেটা বাদ দিয়ে গেছেন সেটা হিন্দু ধর্ম থেকে বাদ চলে গেছে। শঙ্করাচার্য প্রকৃতিলীন অবস্থাটাকে বাদ দিয়ে গেছেন, রেখেছেন শুধু ব্রহ্মলোক। আচার্য আবার এই কথাটা অনেকবার বলবেন, একটা সামান্য ঘাসের টুকরো থেকে একেবারে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যে যেখানে আছে, সবারই এই পুনর্জন্ম চলতেই থাকবে, এই পুনর্জন্ম থেকে কেউ রেহাই পাবে না। এখানে এটাই বলা হচ্ছে, আমি যদি ব্রহ্মলোকেও চলে যাই সময় হয়ে গেলে আবার ফেরত চলে আসতে হবে, আর যদি প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে যাই তাহলে আরও অনেক দিন পর ফেরত আসতে হবে। এই দৃষ্টি থেকে বলা হচ্ছে প্রকৃতিলীন অবস্থায় গেলে তোমার মুক্তির সম্ভবনা আরও পিছিয়ে গেল। বেদান্ত মতে স্বর্গ একটা জেলখানা আর নরকও একটা জেলখানা, দুটো জেলের অবস্থার তারতম্য আছে। একটা জেলে খুব ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়া দেওয়া হচ্ছে আরেকটা জেলে নিকৃষ্ট মানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। একটা গৃহবন্দীর মত আরেকটা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মত। বেদান্তের বক্তব্য হচ্ছে, জেল জেলই, জেল থেকে তুমি কত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাচ্ছো সেই ভাবেই তো বিচার হবে কোনটা ভালো কারামুক্তি। এখন আমি ব্রহ্মলোকে গেলাম পঞ্চাশ বছরের জন্য, আর প্রকৃতিলীন হয়ে থাকতে হবে একশ বছরের জন্য, এখন কোনটা ভালো হবে? ব্রহ্মলোকটাই ভালো হবে, কারণ সেখান থেকে নেমে এসে আবার আমি মুক্তির চেষ্টা করার সুযোগ পেয়ে যাব। কত দিন তোমাকে এইসব স্বর্গলোকে থাকতে হবে, সেই হিসাবে বলা হচ্ছে এটা খারাপ আর ওটা আরও খারাপ। যিশু বলছেন,

একটা ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে হাতি-ঘোড়া-উট পেরিয়ে যেতে পারে কিন্তু স্বর্গের দরজা দিয়ে কোন ধনীলোক যেতে পারবে না। সবাই মনে করে এই সংসারে যারাই ধনী তারাই ভালো, সন্ন্যাসী ছাড়া অর্থ উপার্জন করার বিধান সবাইর জন্য দেওয়া হয়েছে। জাগতিক ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা ভালো মনে করছি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সেটাই মন্দ। জাগতিক দৃষ্টিতে যে স্বর্গকে আমরা বেশি বড় মনে করছি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সেটা আরও বড় খারাপ স্বর্গ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে এখানে নিন্দা করা হচ্ছে।

মহান ঋষি এরপরই বলছেন, তবে কি জানো, তুমি যদি ভালো ভাবে ভোগ করতে চাও, ভোগই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি দুটোকে সমুচ্চয় কর। প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছি যে ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি এবং তৃতীয় মন্ত্র থেকে অষ্টম মন্ত্র পর্যন্ত, মোট এই সাতটি মন্ত্র পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের জন্য। বাকি সব কটি মন্ত্র গৃহস্থের জন্য। এখন যে মন্ত্রের আলোচনা চলছে এটাও গৃহস্থদের জন্য। গৃহস্থকে বলা হচ্ছে, তুমি কার্য ব্রহ্মের উপাসনাও করবে সাথে সাথে আবার কারণ ব্রহ্মের উপাসনাও করবে। দুটোরই উপাসনা করলে কি হবে?

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে।।১৪

বারো নম্বর মন্ত্রে অসম্ভূতি আর সম্ভূতির কথা বলা হয়েছে, চোদ্দ নম্বর মন্ত্রে এসে অসম্ভূতি শব্দটা উড়ে গেল তার জায়গায় এসে গেল বিনাশ শব্দ। এই কারণে ঠিক ঠিক ভাষ্য না নিয়ে ও উপযুক্ত আচার্যের কাছে উপনিষদাদি না পড়লে কিছু বোঝাতো যাবেই না উপরন্তু সব অর্থের তালগোল পাকিয়ে যাবে। এখানে পুরো মন্ত্রগুলোই মনে হবে গোলমেলে, এর মধ্যে আচার্য বেদের একটা নিয়ম করে বলছেন 'অবর্ণলোপ'। অনেক আগে বেদে একটা নিয়ম ছিল কোন মন্ত্র যদি 'অ' দিয়ে শুরু করা হয় তাহলে সেই 'অ'টাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হত। তাই চোদ্দ নম্বর মন্ত্রের প্রথমে যে '*সম্ভূতিং চ*' বলা হচ্ছে আসলে এটা হবে '*অসম্ভূতিং চ*'। আচার্যের এটাই ব্যাখ্যা, এটা এইভাবে না হলে এই মন্ত্রের কোন অর্থ হবে না, আর বেদের যে ব্যাকারণ সেই অনুসারে অবর্ণ লোপ হয়ে গেছে বলে ঐভাবে লেখা হয়েছে। যিনি বিনাশ আর অসম্ভূতির, অর্থাৎ কার্য ব্রহ্ম ও কারণ ব্রহ্ম এই দুটোকে একসাথে নিয়ে উপাসনা করেন, যখন বুঝে নিল দুটো পরস্পর বিরোধী নয় আর দুটোকে সমুচ্চয় করে এক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, তখন কি হয়? *বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা*, কার্য ব্রহ্ম দিয়ে মৃত্যুকে পার করে যাওয়া যায়। এখানে মৃত্যু মানে আপেক্ষিক মৃত্যু, অনৈশ্বর্য, অধর্ম ও কামাদি দোষকে মৃত্যু বলা হচ্ছে, এইগুলোকে সে অতিক্রম করে যায়। তার ফলে কি হয়? *সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে*৷ আচার্য এখানেও বলছেন চোদ্দ নম্বর মন্ত্রে যে দুটো সম্ভূতি শব্দ আছে দুটোই হবে অসম্ভূতি, অসম্ভূতি না হলে এই মন্ত্রের অর্থ করা যাবে না। এই যদি হয় তাহলে সাধারণ মানুষ এই মন্ত্রের অর্থ কি করে বুঝবে, বোঝা সম্ভবই নয়। উপনিষদে বলছে সম্ভূতি কিন্তু আচার্য বলছেন এটা সম্ভূতি না হয়ে অসম্ভূতি হবে, তা না করলে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াবে না। বেদের যখন অর্থ বার করা হয় তখন তাকে ছটি নিয়ম পূরণ করতে হবে, এই ছটি নিয়মকে বলা হচ্ছে ষড়লিঙ্গ, যেটা আমরা এর আগেও উল্লেখ করেছি। এই ছটি নিয়মকে না মেনে যদি অর্থ করা হয় তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। এখানে যদি সম্ভূতিকে সম্ভূতি বলে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ষড়লিঙ্গের নিয়ম ছিটকে যাবে। সম্ভূতিকে যখন অসম্ভূতি করে নেওয়া হচ্ছে তখন ষড়লিঙ্গের নিয়মে অর্থটা বসে যাবে। তাই বলে কি আমি নিজের ইচ্ছে মত শব্দ পাল্টে বসিয়ে দিতে পারি? না, তা কখনই করা যাবে না। বেদের ব্যাকারণে নিয়মই আছে 'অ'বর্ণ লোপ, 'অ'কে লোপ করে দেওয়া যায়। এটা পাণিণির গ্রামার নয়, বেদের ব্যাকারণ। 'অ'কে যদি লোপ করে দেওয়া যায় তাহলে 'অ'কে লাগানোই যেতে পারে, লাগালেও কোন দোষের হবে না, 'অ' যদি লাগিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ষড়লিঙ্গের নিয়মও বসে যাচ্ছে। তাহলে তুমি 'অ' লাগিয়ে নাও। এইখানে এসে বোঝা যায় বেদ পড়া, উপনিষদ পড়া কেন এত কঠিণ। বেদ উপনিষদ পড়তে গেলে আগে থেকে কত কিছু জানতে হয়। আচার্য শঙ্করের পরে যে অন্য কোন দার্শনিক প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো না তার মূল কারণ এটাই। আচার্যকে কত কিছু জানতে হচ্ছে, তবে গিয়ে এর অর্থ উদ্ধার করছেন।

এখানে বলছেন, মানুষ যখন হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করে তখন সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে যায়। কি মৃত্যুকে পার করেন? আচার্য শঙ্কর বলছেন, অনৈশ্বর্য রূপ যে মৃত্যু, এটাকে পার করে। অনৈশ্বর্য রূপ কোনটা? এখন দেশে যে কাঙালীতে ভরে গেছে, লোকের গায়ে কাপড় নেই, থাকার জায়গা নেই, এক মুঠো অন্ন জুটছে না, এটাকে বলা হচ্ছে অনৈশ্বর্য। মানুষ

যদি অনৈশ্বর্য হয়ে পড়ে তখন এটা এক প্রকার মৃত্যুর সমান। মানুষের চাকরি নেই, পেটে অন্ন নেই, মাথার উপর ছাদ নেই, ভিখারীতে দেশ ভরে যাচ্ছে, শাস্ত্র বলছে এটাকে তুমি আটকাও। ঐশ্বর্যের বিপরীত হল অনৈশ্বর্য। অনৈশ্বর্যকে তুমি কিভাবে দূর করবে? কার্য ব্রহ্মের উপাসনা করে। আমাদের ভাষায় বলতে পারি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরী বিদ্যার প্রসার করে সেটাকে জাগতিক অভ্যুদয়ে লাগানো হবে। স্বামীজী তাই বলছেন - By controlling nature, internal and external এখানে যেটা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা, তাকেই স্বামীজী বাহ্য প্রকৃতির দমনের কথা বলা হচ্ছে। বাহ্য প্রকৃতির দমন না করলে জাগতিক অভ্যুদয় হয় না, মানুষ যে রোজ রোজ অভাব রূপী দুঃখের সম্মুখীন হয়ে কষ্ট পাচ্ছে এটা হিরণ্যগর্ভের উপাসনার দ্বারা পার করতে বলা হচ্ছে।

কিন্তু বেদতো শুধু জাগতিক ব্যাপারেই বলতে থাকবে না, বেদ বলবে কার্য ব্রহ্মের উপাসনা করে তোমার অনৈশ্বর্য রূপী অভাব এটাকে দূর কর। আচার্য তার ওপর আবার যোগ করে বলছেন, শুধু যে তোমার ভালো বাড়ি, ভালো পোষাক আর ভালো খাওয়া-দাওয়া জুটবে তা নয়, অণিমাদি যে ঐশ্বর্য আছে সেটাকেও তোমাকে প্রাপ্ত করতে হবে। এখানে এসে আমাদের আবার খট্‌কা লাগবে। এখন কেউ যদি এসে এখানে বলে, আপনার যাই ভাবুন আমি কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি ঈশ্বরকোটি লোক, আমি ঈশ্বরদর্শন প্রাপ্ত পুরুষ, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটেন। আমরা কেউ প্রমাণ করতে পারবো কি যে, এই লোকটি মিথ্যে কথা বলছে? প্রমাণ করার কোন পথ নেই। একজন মানুষ যদি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ধাপ্পা মারে, তাকে ধরার কোন উপায় নেই। সেইজন্য ঠাকুর যখন তাঁর নানা অনুভূতির কথা বলতেন নরেন বলত, এগুলো আপনার মনের ভুল। স্বামীজী এটা বলছেন না যে, আপনি ধাপ্পা মারছেন, বলছেন এগুলো আপনার মনের ভুল। কারণ আধ্যাত্মিক জগৎ হল স্বসংবেদ্য, স্বংবেদনা মানে জানা, তার মানে যে জানে সেই জানে, অন্য কেউ জানতে পারেনা। আমি ব্রহ্মজ্ঞ কিনা একমাত্র আমিই জানতে পারব, ঠাকুর আমার সাথে সাথে হাঁটেন কিনা এটা আমিই জানতে পারবো, অন্য কারুর জানার কোন পথই নেই। কিন্তু কিছু কিছু লক্ষণ আছে। তার মধ্যে আচার্য এখানে উল্লেখ করছেন অণিমাদি ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে থাকবে, তার মানে সিদ্ধাই তাঁর থাকবে কিন্তু সিদ্ধাইকে তিনি প্রয়োগ করেন না। সিদ্ধাইকে সে কামনা করে না, কিন্তু আপনা থেকেই তাঁর মধ্যে এসে যায়। কারণ তিনি এখন কার্য ব্রহ্মের মালিক, তিনি এখন কারণ ব্রহ্মের মালিক, তিনি এখন ঈশ্বরের সঙ্গে এক, পুরো প্রকৃতি তাঁর আজ্ঞাধীন। ঠাকুর বলছেন, যখন ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায় তখন বড়লোকেরাও তাঁকে মানে। আবার অন্য দিকে বড়লোকরা তাঁর কাছে আসুক এই ভাব তার মনের মধ্যে কখনই উঠবে না। কারণ তিনি এখন ঐশ্বর্যবান পুরুষ হয়ে গেছেন, তাই কোন ঐশ্বর্যবান পুরুষকে দেখে তাঁর চোখ ঝলসে উঠবে না। আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে? এখন যদি বলা হয় এখানে রাজ্যপাল আসছেন, আমরা সবাই এখন তটস্থ হয়ে যাব, এখানে একটা আলোড়ন হয়ে যাবে। কারণ রাজ্যপালের ঐশ্বর্যে আমাদের চোখ ঝলসে যাচ্ছে। নিজামুদ্দিন ওউলিয়া বলে একজন খুব নামকরা সুফি সাধক ছিলেন। একবার তাঁর কাছে খবর পাঠানো হল দিল্লীর শাহেনশা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। যখন বাদশার আসার সময় হয়েছে তিনি নিজের কুঠিয়ার পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইনা। এতো শুধু দিল্লীর বাদশা, আর আমিতো আল্লার যে সাম্রাজ্য তার বাদশা। নিজামুদ্দিন শেষ পর্যন্ত বাদশার সাথে দেখাই করলেন না। কোন একজন রাজা একবার চাইল এই নিজামুদ্দিনকে শিক্ষা দিতে। নিজামুদ্দিন তাকে বলে পাঠাল দিল্লী দুরস্তু, মানে দিল্লী এখনও অনেক দূর। ঐ রাজা বাংলার কাজ সেরে দিল্লীতে তখন ফিরে আসছিল, ফিরে আসার পথে বাদশাকে খবর পাঠাল আমি গিয়ে নিজামুদ্দিনকে শিক্ষা দিচ্ছি, ওর এত বড় আস্পর্দা আপনার সাথে দেখা করতে চায়না! কপাল এমনই সেই রাজা দিল্লী ফিরে আসার আগেই মাঝ পথে মারা গেল। তাঁর এমন শক্তি যে তিনি জানতেন যে সে দিল্লী পৌঁছাতেই পারবে না, তার আগেই সে মারা যাবে। ভাব রাজ্যের যারা রাজা তাঁরা এদেরকে পাত্তাই দেন না। ঈশ্বরের যে ঐশ্বর্য তাকে এনারা এমন ভাবে দুটো হাতে নাচান, তাঁদের কাছে জাগতিক ঐশ্বর্য সূর্যের আলোর কাছে প্রদীপের আলোর মত হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন মিছরির পানা যে একবার খেয়ে নিয়েছে চিটে গুড়ের পানা তার আর ভালো লাগবে না। জাগতিক ঐশ্বর্য তাঁর কাছে চিটে গুড়ের পানার মত, কারণ তিনি মিছরির পানার আস্বাদ পেয়ে গেছেন। কার্য ব্রহ্মের উপাসনা করলেই অণিমাদি ঐশ্বর্য এসে যাবে। আর কারণ ব্রহ্মের উপাসনা যখন করা হল তখন শক্তি আরও বেড়ে গেল। মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু মুক্তির কথা বলা হচ্ছে না। কারণ গৃহস্থের জন্য মুক্তির কথা বেদে বা উপনিষদে কোথাও বলবে না। তুমি যদি মুক্তির পথে চলতে চাও তাহলে তোমাকে সন্ন্যাসী হতেই হবে, সন্ন্যাসী ছাড়া মুক্তি হতেই পারেনা। তাহলে গৃহস্থের কি হবে? ঈশ্বরে ভক্তি হবে। আর যে গৃহস্থ বলবে আমার আর কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই, আমি কিছুই চাইনা, সেতো সন্ন্যাসীর মতই হয়ে গেল। সন্ন্যাসী শুধু গেরুয়াতেই হয় না, সন্ন্যাসী হচ্ছে মনের অবস্থা। বেদ মতে সন্ন্যাসী তাকেই বলা হয় যে তিনটে জিনিষকে পুরোপুরি ত্যাগ করে দিয়েছে, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। জাগতিক দুটো

পুত্রৈষণা আর বিত্তৈষণা, ঠাকুরের ভাষায় কামিনী-কাঞ্চন, আর তৃতীয়টা হচ্ছে পরলোক, লোকৈষণা, মৃত্যুর পর আমি ব্রহ্মলোক যাবো, বিষ্ণুলোক যাবো, রামকৃষ্ণলোক যাবো এই এষণার ত্যাগ। সেইজন্য বলা হয় বেদান্ত পাঠের কে অধিকারী, যার ইহলোক আর পরলোক এই দুটোর প্রতি আসক্তি চলে গেছে। এখন কোন গৃহস্থও যদি বলে আমার পুত্র, বিত্ত কোন দিকে আসক্তি নেই আর স্বর্গলোকের দিকেও আসক্তি নেই। তখন কি হবে? গৃহস্থ হয়েও তুমি এখন সন্ন্যাসীর অধিকারী হয়ে গেলে। যার পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা চলে গেছে, এখন সে গৃহস্থই হোক আর ঘরবাড়ি ছাড়া সন্ন্যাসীই হোক, সে এখন মুক্তি পথের পথিক হয়ে গেল। কিন্তু এই তিনটে এষণা থেকে মানুষের মন যেতেই চায় না। সংসারে লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে অনেক সময় মনে হয় সব এষণা চলে গেছে, কিন্তু তা যায় না। শত দুঃখের মধ্যেও যেমনি সুখের একটু শান্তি জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তখনই আবার সব এষণা এসে হাজির হয়ে নতুন উদ্যমে তাকে নাচাতে থাকে।

বয়স হয়ে গেলে জড়া আর ব্যাধি যখন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে তখন মাথায় আর পুত্র বিত্তের কামনা আসে না। তাহলে বয়স হয়ে গেলে তো সে তখন মুক্ত পুরুষ হয়ে গেল। কিন্তু শাস্ত্রতো কোথাও বলছে না, বুড়ো হয়ে গেলে মুক্তো হয়ে যায়। কেন মুক্তো হয় না? কারণটা গীতাতেই বলে দেওয়া হয়েছে – *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*, এঁরা এখন নিরাহারী হয়ে গেছেন। রান্না যখন হয় তখন বলে বৌমা রান্নাতে বেশি ঝাল মশলা দিও না, শরীর খারাপ হয়ে যায়। একটা বয়সের পর মানুষের ভোগ করার ক্ষমতাই চলে যায়, যেগুলোকে নিয়ে ভোগ করছিল সেই ভোগের জিনিষে এখন বিকার এসে গেছে, এদেরকে এখানে ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না। তাহলে কাদেরকে নেবে? তোমার যদি কুড়ি পঁচিশ বছর হয়ে থাকে, যেটাই তুমি ভোগ করতে চাইবে সেটাকে অর্জন করতে পারার ক্ষমতা থাকতে হবে আর ভোগও করতে পারবে। দেখাবে, এই দ্যাখো আমি অর্জন করলাম, দেখিয়ে বলছে এই আমি এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আমাদের কারুর এই ক্ষমতা আছে কি যে, ভালো ভোগের সামগ্রী অর্জন করতে পারব! আমরা বেশির ভাগই তো কাঙালীর পর্যায়ে, আর যাদের একটু যাও অর্জন করার ক্ষমতা আছে তাদের আবার কারুর পেট খারাপ, কারুর ব্লাড সুগার, কারুর কোলোস্টোরাল, কারুর লিভারের গণ্ডগোল, এরা কিসের সন্ন্যাসী হবে! যাদের মধ্যে অসীম ক্ষমতা আছে তারাই পারে সন্ন্যাসী হতে। স্বামীজী বলছেন, আমার মধ্যে এমন শক্তি যে চাইলে জগতটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে পিষে দিতে পারি। এই শক্তি চাই, এই শক্তি থাকার পর যদি সে বলতে পারে আমার পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণার কোনটাই নেই, তখনই সে সন্ন্যাসীর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না কার ভেতরে কি এষণা আছে, সেইজন্য বলা হয়, তোমার যদি বয়স কম থাকে, বিয়েথা যদি না করে থাক, তোমার ওপর যদি সংসারের কোন ঝামেলা বা দায়ীত্ব না থাকে তবেই তুমি সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য আসতে পার। এর মধ্যে কোনটাতে যদি তুমি অযোগ্য বিবেচিত হও তাহলে বলা হবে তোমার এখন সন্ন্যাসী হওয়াটা বন্ধ রাখ। অনেক ভক্ত পরিবারের লোকের এসে প্রায়ই বলে, মহারাজ আমার ছেলেটা ভীষণ অবাধ্য, পড়াশোনা করতে চায় না, একে নিয়ে গিয়ে আমরা সন্ন্যাসী বানিয়ে দিন। এরা ভাবে যারা কোথাও কিছু করতে পারবে না, তারাই এসে শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। এদের কি করে বোঝানো যাবে যে সন্ন্যাসী হতে গেলে আগে তার বিল গেটসের মত অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা থাকা চাই, সিনেমার হিরো হিরোইনদের মত জগতকে নাচানোর ক্ষমতা থাকা চাই, এই ক্ষমতাগুলো থাকার পরেও যে বলতে পারবে আমার জগতের কোন কিছুই লাগবে না, একমাত্র তখনই সে সন্ন্যাসী হতে পারবে, তার আগে সে পারবে না। ঐ শক্তি যদি না অর্জন করা থাকে তাহলে কালকেই যদি অতি সাধারণ একটা ভোগের প্রলোভন এসে গেলে তুমি ছিটকে বেরিয়ে যাবে। বার্ধক্যগ্রস্ত কাউকে যদি এখনই তরতাজা যুবকের মত একটা শরীর দিয়ে দেওয়া হয় তখন আবার তার ভোগের বীজগুলো তেড়েফুড়ে বেরিয়ে আসবে। এই জিনিষগুলো আমাদের শাস্ত্রকাররা জানতেন, সেইজন্য তাঁরা বলছেন এই সব বেদের মন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তুমি চেষ্টা করে আগে ভোগ করার ক্ষমতা অর্জন করে ভোগ কর। এই কারণেই অল্প বয়সে আমাদের সন্ন্যাসের প্রথা হিন্দুদের ছিল না। কিন্তু পরের দিকে দেখা গেল অনেকে জন্ম থেকেই সন্ন্যাসীর দিকে প্রবৃত্ত হয়ে আছে, তখন তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অন্য ধরণের ব্যবস্থা চালু হল। সমগ্র মানবজাতি একমাত্র যোগ্য গৃহস্থ ধর্মের জন্য, গৃহস্থ ধর্ম মানে তার মন ভোগের দিকে পড়ে আছে। তখন শাস্ত্র বেঁধে দিচ্ছে, তুমি ভোগ করতে চাইছ এতে অন্যায় কিছু নেই, কিন্তু এইভাবে ভোগ কর। বেদবিহিত যে ভোগ আছে শুধু এটাই ভোগ করবে, এর বাইরে তুমি কখনই পা দিও না। তাহলে তুমি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। আর সমাজে ও পরিবারে সবাই পরস্পর পরস্পরের ভালো-মন্দের দিকে নজর রাখবে, ঝগড়া বিবাদ করবে না। সাথে সাথে কি করবে? কর্মকাণ্ড করবে, দেবতা বিষয়ক উপাসনা করবে, সম্ভূতির উপাসনা করবে আবার অসম্ভূতিরও উপাসনা করবে, সবটাই তোমাকে করতে হবে। এই কথাই ছটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে।

মানুষ যখন সম্ভূতির বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করে তখন অনিমাদি ঐশ্বর্য পেয়ে যায়, তখন সে বিরাট কিছু হয়ে গেল। এর সাথে সাথে সে যদি অসম্ভূতির উপাসনা করে, মানে প্রকৃতির যখন উপাসনা করে তাতে যদি সে সিদ্ধি পেয়ে যায় তখন সে প্রকৃতিলীন হয়ে যায়। মানবজীবনে গৃহস্থদের পক্ষে সব থেকে উচ্চাবস্থা হচ্ছে এই প্রকৃতিলীন অবস্থাকে প্রাপ্ত হওয়া। প্রকৃতিলীন হলে কি হবে? যত দিন সৃষ্টি থাকবে তত দিন এই সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ হয়ে থাকবে। যখন সৃষ্টি লয় হয়ে যাবে তখন তোমারও লয় হয়ে যাবে, যখন আবার সৃষ্টি হবে তখন তুমি আবার ফেরত চলে আসবে কিন্তু ঐশ্বর্যবান হয়ে আসবে। প্রকৃতিলীনের উপরে আর কিছু হয় না, তার ওপরে হচ্ছে মুক্তি, ব্রহ্মের সঙ্গে এক। মুক্তির জন্য তোমাকে কি করতে হবে? প্রথম মন্ত্রেই সেটা বলে দেওয়া হয়েছে, *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*, সব কিছু ত্যাগ করে জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করতে হবে, *মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্*, অপরের কি আছে সেদিকে লোভ করবে না, আর তোমার কাছে যা আছে সেটাকে নিয়ে মোহ করবে না, আর বলছেন *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক*, নিজের ভেতরে সমস্ত প্রাণীকে যে দেখছে আর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে নিজেকে দেখছে তখন সে কাকেই বা মোহ করবে আর কি নিয়েই বা সে শোক করবে। আমি যদি বলি, আমাকে একটু লোভ করতে দাও বেশি লোভ করব না, তাহলে তো মুক্তি হওয়া যাবে? না, মুক্তি হবে না। যার মনে সামান্য লোভও যদি থাক, যদি অল্প শোক মোহও থাকে তাহলে কিন্তু তার জন্য সন্ন্যাস পথ নয়। তার জন্য গৃহস্থ ধর্ম। এখন সে গৃহস্থ ধর্মে কর্মকাণ্ড করে, দেবতা বিষয়ক উপাসনা করে, সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনা করে প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে গেল। এখন সে যদি বলে – না, আমি এরও উপরে যেতে চাই। তাহলে বাপু তোমাকে এখনই শুরু করতে হবে। কোন বাচ্চাকে যখন তার বাবা-মা চান বিরাট কিছু বানাতে, তখন তাকে বাচ্চা বয়স থেকেই ভালো শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হয়, ভালো স্কুলে, ভালো কলেজে, আইআইটিতে পড়াতে হবে তবে গিয়ে সে বিরাট কিছু হতে পারবে। ঠিক তেমনি তুমি যদি বল প্রকৃতিলীন হয়ে আমার কিছু হবে না, আমাকে তারও ওপরে যেতে হবে। তখন তোমাকে বলবে, তোমাকে বাপু তাহলে বাচ্চা বয়স থেকেই শুরু করতে হবে। কি করতে হবে তোমাকে? নিজের বা পরের ঐশ্বর্যের প্রতি লোভ করবে না। যেটা পাচ্ছ না, সেটার প্রতি কোন মোহ করবে না, যেটা চলে যাচ্ছে সেটাকে নিয়ে শোক করবে না, সব কিছুতেই ঈশ্বরকে দর্শন করবে। এগুলো যদি তুমি করে যেতে পার তাহলে একদিন প্রকৃতির এলাকাকেও তুমি ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

এখানে এত কিছু আলোচনা করার একটাই উদ্দেশ্য, বেদে যে দুটি মার্গের কথা বলা হয়েছে প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ, এই দুটো মার্গকে তুলে ধরা। যে সন্ন্যাসীর জীবন অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গের দিকে যেতে চাইছে তাকে বলা হচ্ছে সব কিছু ত্যাগ করে দিয়ে তুমি এগিয়ে যাও। যারা এটা পারবে না তাদের জন্য প্রবৃত্তিমার্গ, মানে তুমি কর্ম করে যাও। এরপরে তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন তুমি কিভাবে কাজ করবে? *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ*, শত বছর যদি বেঁচে থাকতে চাও তবে তুমি কাজ কর। আর উপাসনা কিভাবে করবে? কর্মের সাথে দেবতার উপাসনা করবে, সম্ভূতির উপাসনা করবে আবার অসম্ভূতির উপাসনা করবে।

এইভাবে একজন গৃহস্থ কর্ম ও উপাসনা করে করে তার জীবনটা একেবারে সৎ হয়ে গেছে। এবার তার সময় হয়ে এসেছে, মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছে। এই ধরণের লোক মৃত্যুর সময় নিজের জ্ঞানটাকে হারাবে না। এখানে উপনিষদও মেনে নিয়েছে এদের জ্ঞান হারাবে না। সে বুঝে নিল এখন তার মৃত্যুর সময় এসে গেছে, বুঝে যেতেই সে প্রার্থনা করতে বসে গেল –

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।১৫

বেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মত যে, আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে প্রত্যকে ইন্দ্রিয়ের একজন করে অধিষ্ঠাত্রি দেবতা আছেন, সেই দেবতা আবার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেও আছেন। যেমন বলা হয় দক্ষিণ নেত্র হল আদিত্য দেবতার বাস, সেই আদিত্য আবার আছেন সূর্যে। তার মানে সূর্য, আদিত্য আর নেত্র এই তিনটেই এক। এই ভাবটাকে নিয়ে মৃত্যুর সময় যাচক প্রার্থনা করছে। গীতাতেও এই ভাবটা পাই – *সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ*, মৃত্যুর সময় সাধক তার মনটাকে পুরো গুটিয়ে এনে পুরো নিজের শক্তিতেই শরীরটাকে ছেড়ে দিচ্ছেন, যম এসে তাকে বেধে নিয়ে যেতে পারেনা। এঁরাই হচ্ছেন

ঠিক ঠিক যোগী। এখানেও যোগী নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত জীবন কর্ম ও উপাসনা করে এসেছে কিন্তু সন্ন্যাসী হয়নি, এখন তার মৃত্যুর সময় এসে গেছে বুঝে গেছে এবার সে পুরো মনটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে সূর্যকে বলছে – *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্* - হে সূর্য, সত্যের মুখ সোনা দিয়ে আবৃত, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই সোনার আবরণটাকে তুমি সত্যের মুখ থেকে সরিয়ে দাও। আমি কাঙালীর মত তোমার কাছে প্রার্থনা করছি না, আমি কাঙালী নই, আমি হচ্ছি *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, আমি সত্যধর্মা, সারা জীবন আমি ধর্মের অনুষ্ঠান করেছি, সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। কিসের আবরণের কথা বলছেন? আদিত্য মণ্ডলে সূর্যের যে রূপ, সেটা যেন ব্রহ্মের দ্বার, সেই দ্বারটাকে খুলে দাও। এখানে কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা চলছে। গীতার অষ্টম অধ্যায়তেও বলা হয়েছে যে, সগুণ উপাসক একভাবে যায় নির্গুণ উপাসক একভাবে যায়, পিতৃ উপাসকরা অন্য রকম যায়। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে সগুণ ব্রহ্মের উপাসকরা কিভাবে মৃত্যুর সময় তার চিন্তা ভাবনা করে।

যতক্ষণ দরজা না খুলে দেওয়া হয় ততক্ষণ সে ঐ পথ দিয়ে যেতে পারবে না। তাই সে দেবতাকে প্রার্থনা করে অনুরোধ করছে আমি আসছি তাই তুমি দরজা খুলে দাও। কিন্তু এই প্রার্থনার পেছনে কিসের শক্তি? *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, আমি সৎ ভাবে জীবন-যাপন করেছি, তাই আমি প্রার্থনা করছি তুমি দরজাটা খোল। ঠাকুর খুব মজা করে এই গভীর ভাবটাকে বলছেন – কোন মেয়ে যদি অসতী হয়ে যায়, তখন সে তার উপপতির জামা ধরে টেনে বলে – তবে রে শালা, তোর জন্য আমি সব ছাড়লাম আমাকে দেখবি না মানে! এমনই উপপতিকে ভালোবেসেছে যে সে কলঙ্কিত হয়ে গেছে, এবার সে উপপতির জামাটি ধরেছে। আমি সত্যধর্মা, আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তুমি এই রাস্থা আমার জন্য খুলে দাও। আমি যথার্থ ধর্ম অনুষ্ঠান করেছি। আচার্য এক জায়গায় বলছেন – যাদের আত্মসংযম হয়ে গেছে তারাই কেবল অবলোকন করতে পারে নেত্রে যে আদিত্য সূর্যেও সেই আদিত্য। আদিত্য হলেন দেবতা, এখন সে নিজের সত্তাকে ছেড়ে ঐ দেবতার সত্তার সাথে এক হয়ে যাচ্ছে। এরপর সে আর মানুষধর্মা থাকবে না, সে দেবতাধর্মা হয়ে যাবে।

আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ঈশাবাস্যোপনিষদ হল শুক্লযজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায়। শুক্লযজুর্বেদ পেয়েছিলেন যাজ্ঞবল্ক ঋষি। যাজ্ঞবল্ক ঋষি তাঁর গুরুর সাথে বিবাদ হয়ে যাওয়ায় তিনি গুরুকে ত্যাগ করে দিলেন। নিজের গুরুকে ত্যাগ করে এসে তিনি সূর্যের উপাসনা করতে শুরু করলেন, সেখান থেকে পুরো যজুর্বেদকে তিনি আরেকবার নতুন করে পেলেন। এইভাবে যজুর্বেদের দুটো শাখা হয়ে যায়, শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ। শুক্ল নামটা এসেছে সূর্যোপসনা করে যাজ্ঞবল্ক এই বেদ পেয়েছিলেন বলে, আর তাই এতে সূর্যোপসনাটা বেশি করা হয়েছে। ঈশাবাস্যোপনিষদ যেহেতু শুক্লযজুর্বেদের অংশ তাই এখানে সূর্যের উপাসনার কথা চলছে। সূর্যের উপাসনাতে সূর্যের স্তুতি করা হচ্ছে –

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।।১৬

কিভাবে সূর্যের স্তুতি করা হচ্ছে? *পূষন্*, যিনি জগতের পোষন করেন। সূর্যের আরেকটি নাম পূষন, সূর্য না হলে জগতের পরিপোষন হবে না। তিনি কি রকম? *এক-ঋষে*, যিনি একাকী আকাশ পথে চলেন, সূর্য একাই চলেন তাঁর সাথে কেউ চলে না। *যম*, যিনি সব কিছু গ্রহণ করেন। যমরাজ যেমন একদিকে সবার প্রাণকে হরণ করেন তেমনি অন্য দিকে তিনি সব কিছুর নিয়মন করেন। তেমনি সূর্যের গতিকে দেখে সবাই তাদের কাজ কর্ম ঠিক করে, সূর্য যখন ভোর বেলা উদিত হচ্ছে তখন জগৎ এক রকম ভাবে চলছে, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় এক রকম কাজ হচ্ছে, দ্বিপ্রহরে অন্য রকম কাজ হচ্ছে। সারাদিন ধরে যা কিছু হচ্ছে সূর্যই তার নিয়মন করছেন, সেইজন্য সূর্যের আরেক নাম যম। তেমনি সূর্য যত রকমের রস আছে সব রসকে শোষণ করেন, যেমন সমুদ্র, নদীর জল, মানুষের শরীরের রস সূর্য শোষন করে, তাই তাঁর নাম সূর্য, *শ্রীকরণাৎ* সব কিছুকে গ্রহণ করেন। *প্রাজাপত্য*, সূর্য একজন প্রজাপতিও। যদিও প্রজাপতি বা দেবতাদের এখন সেই কদর নেই, কিন্তু আগেকার দিনে প্রজাপতি বা দেবতাদের খুব সম্মান দেওয়া হত। হে সূর্য তোমার এই চোখ ঝলসানো আলোটাকে একটু প্রশমিত কর, কারণ ভেতরে যিনি আদিত্য দেবতা আছেন তোমার এই তেজের জন্য আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। এটা হচ্ছে মৃত্যুর সময়কার প্রার্থনা, আগে কখন সে এই রকম প্রার্থনা করেনি। গীতাতেও বলা হচ্ছে – *যং যং*

বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্, যে যে দেবতার ভাব মৃত্যুর সময় চিন্তা করে দেহত্যাগ করবে সে সেই সেই দেবতার ভাব পেয়ে যাবে। এখানেও একজন দেবতার ভাবকে চিন্তা করে সে তার দেহকে ছাড়তে চলেছে? এখানে কোন্ দেবতার ভাব নিচ্ছে? আদিত্য দেবতার ভাব। আর বলছেন *যত্তে রূপং কল্যাণতমং,* তোমার যে কল্যাণ রূপ, কল্যাণ রূপ বলতে বলছেন তোমার পরম সুন্দর স্বরূপ যেটা, সেই স্বরূপ আমি দেখতে চাই। আমি তোমার সেবক হিসাবে এই প্রার্থনা করছি না. কাঙালীর মত যাচনা করছি না, *যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি,* তোমার ভেতরে যে আদিত্য দেবতা রূপী পুরুষ আছেন, সেটা আমিই। আমি আর সেই আদিত্যমণ্ডলে পুরুষ অভিন্ন। আমার যে বাস্তবিক স্বরূপ সেটা হচ্ছে তোমার ভেতরে ঐ আদিত্য যিনি আছেন, যাঁকে তুমি সুকৌশলে তোমার তেজোময় কিরণেরে দ্বারা আবৃত করে রেখেছ, ওটা আমিই। তুমি যদি তোমার কিরণকে সংবরণ করে তেজকে উপসংহার করে ঐ স্বরূপটা একবার আমাকে দেখিয়ে দাও তাহলে আমি তাঁর সাথে এক হয়ে যাব। আমি যদি তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাই তাহলে মৃত্যুর পর আমি সেই আদিত্যলোকে তাঁর মধ্যেই চলে যাব, সেইজন্য তুমি তোমার জ্যোতির্ময় আবরণটা সরিয়ে দাও। আর বলছেন –

বায়ুরনিলমমৃতমেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭

সারা জীবন সে সূর্যের উপাসনা করে এসেছে, এখন মৃত্যুর আগে তার সূর্যের কাছে প্রার্থনাও করা হয়ে গেছে, প্রার্থনা করে তার মনটাকে পুরো গুটিয়ে নিয়ে এসেছে, এবার সে মরতে চলেছে। বলছে, আমার যে বায়ু, মানে প্রাণ, আমার এই আধ্যাত্মিক দেহটাকে ভেঙ্গে দিয়ে আধিদৈবিক, যে সর্বাত্মক বায়ু আছে, সেটার সঙ্গে যেন এক হয়ে যাক। অর্থাৎ, আমার শরীরে যে প্রাণ এতদিন কাজ করছিল সে এই শরীরটাকে ভেঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সর্বব্যাপী প্রাণ রয়েছে তাঁর সাথে এক হয়ে যাবে। মানুষ যেমনটি কাজ করে, যেমনটি চিন্তা করে সেই রকমই তার সূক্ষ্ম শরীর তৈরী হয়। এখানেও তাই বলছে, আমার যে জ্ঞান ও কর্ম দিয়ে তৈরী সূক্ষ্ম শরীর সেইখান থেকে বেরিয়ে আসুন। বেরিয়ে এসে কি বলবে? ওঁ। ওঁ উচ্চারণ করে সে বলবে – হে ক্রতো, ক্রতো মানে মন, এখানে সঙ্কল্পাত্মক মন, যিনি কোন কিছু করার সঙ্কল্প করেন। এখন তার সব কিছু করা হয়ে গেছে, যাচনা করা হয়ে গেছে, প্রাণবায়ুকে টেনে একটা যোগের অবস্থা করে নিয়েছে, এবার মনটাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে – *ওঁ ক্রতো স্মর,* হে সঙ্কল্পাত্মক মন আমি সমস্ত জীবনব্যাপী যা যা শুভ কর্ম করেছি সেগুলোকে তুমি স্মরণ কর। ঠাকুর বলছেন, ঘোর বিষয়ী মৃত্যুর সময়েও প্রদীপের তেল পুড়তে দেখে বলে – তেল পুড়ে যাচ্ছে পিদ্দিমের সলতেটা কমিয়ে দে। কিন্তু যিনি যোগী, সারা জীবন ব্যাপী সাধনা করে গেছেন, মৃত্যুর সময় এসে গেছে বুঝে নিয়ে আসনে বসে পড়ে পুরো শরীর মনকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রার্থনা করা হয়ে গেল, এইবার প্রাণবায়ুকে একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে নিয়েছে তারপর মনকে বলছে – হে মন, সারা জীবন ধরে তুমি যত ভালো কর্ম করেছ, যা কিছু শুভ কর্ম করেছ সেগুলোকে তুমি স্মরণ করতে থাক। এগুলো এখন পাল্টে গেছে, আমাদের এখন মরার সময় হরিনাম করা হয়, মনে যাতে হরিনাম চিন্তা আসে। কিন্তু এতে কিছুই হয় না। সাধারণ মানুষের মন মৃত্যুর অনেক আগেই হারিয়ে যায়, মনের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, মন যেদিকে যেতে চায় সেদিকেই যায়। কিন্তু এনারা হচ্ছেন ঋষি, যোগী, তাঁর মনকে পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে সঙ্কল্পাত্মক মনকে বলছেন, হে মন তুমি এবার ভালো ও শুভ যা কিছু করেছিলে মনে কর। মনকে বলে দিয়ে শেষে বলছেন –

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।।১৮

এবারে শরীর তার চলে যাবে, অগ্নিতে তার এই দেহের দাহ সংস্কার করা হবে। তাই আগেই অগ্নির কাছে প্রার্থনা করে রাখছে – হে অগ্নি, একটু পরে আমার এই শরীরটাকে তোমাতে আহুতি দেওয়া হবে, মানে দাহ সংস্কার করা হবে, তুমি আমাকে *সুপথা,* মানে ভালো পথে নিয়ে চল। আচার্য এখানে একটা ভালো শব্দ যোগ করে বলছেন দক্ষিণমার্গে নিবৃত্তির জন্য এটা করা হচ্ছে, তার মানে হল, আমি যেন পিতৃমার্গে না যাই, আমি যেন উত্তরমার্গে গমন করে দেবতার

লোকে যেতে পারি। বলছেন দক্ষিণমার্গ হল আবাগমন রূপী, পিতৃলোকে যারা যায় তাদের উপর নীচে আসা যাওয়া চলতেই থাকবে। ঠাকুর এই কারণে শ্রাদ্ধবাড়ির অন্য খেতে নিষেধ করছেন, শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যাকে যে জিনিষটা নিবেদন করা হয় তার প্রসাদ গ্রহণ করলে সে সেখানেই যায়। তাই এখানে ঋষি বা যোগী বলছেন, আমার যা কিছু করার হয়ে গেছে, আমার আর কিছু চাইনা, তাই উত্তরায়ণ দিয়ে আমাকে দেবলোকে নিয়ে চল। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে উত্তরায়ণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন – যাঁরা অনাসক্ত ভাবে শুভ কর্ম করেন মৃত্যুর পর তাঁরা দেবলোকে থাকেন। দেবলোকে পুরো অনাসক্ত হয়ে থাকলে যখন সৃষ্টির নাশ হয় তখন তাঁদেরও মুক্তি হয়ে যায়। অনাসক্ত ভাবে কর্ম করে গেলে যে মুক্তি হবে না, তা নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই পথেই যেতে বলেছেন।

এরপর অগ্নিকে বলছেন, আমাকে যে তুমি উত্তরায়ণের সুপথে নিয়ে যাবে তাই নয়, আমার যদি অল্প কিছু পাপ কর্ম হয়ে থাকে তুমি সেটাকেও তোমার অগ্নি দিয়ে নাশ করে দাও। হে অগ্নি, সারা জীবনব্যাপী অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা আমি তোমার উপাসনা করে এসেছি, এখন আমার ইন্দ্রিয়ের কোন ক্ষমতা নেই, আমি মৃত্যুর জন্য সঙ্কল্প করে নিয়েছি। সেইজন্য *যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো*, একবার যখন তুমি আমার পাপ কর্মগুলো নষ্ট করে দেবে তখন আমি নিজেই আমার স্বাভাবিক অবস্থায় উচ্চতম গতি প্রাপ্ত করে নেব। যার যখন কেউ ভালো করে তখন তার সেবা করতে হয়, অগ্নি তুমি আমার ভালো করতে যাচ্ছ, তবে আমি তো এখন তোমাকে আগের মত পরিচর্যা করতে পারছি না, আমার তো এখন সেই ক্ষমতা নেই। সেইজন্য, *ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম*, হে অগ্নি, তোমাকে আমি বারবার অনেক অনেক প্রণাম নিবেদন করছি, তুমি আমার ছোটখাটো পাপগুলোকে নাশ করে দাও আর দ্বিতীয়তঃ আমাকে উত্তমমার্গ দিয়ে উচ্চলোকে নিয়ে চল যাতে আমাকে আর জন্ম নিতে না হয়।

যারা গৃহস্থ তারা যখন মুক্তির দিকে অগ্রসর হয় তখন তারা এই পথ দিয়েই যায়। যারা সন্ন্যাসী তারা যখন মুক্তির দিকে যায় তার এক ভাবে যায়, যারা গৃহস্থ তারা মুক্তির দিকে কিভাবে যাবে? এখানে সেটাই বর্ণনা করা হচ্ছে। তোমাকে সব কিছু সমুচ্চয় করতে হবে, কর্ম ভালো ভাবে করবে, কোনটাকেই বাদ দেবে না আর তোমার মনের উপর এমন নিয়ন্ত্রণ থাকবে যাতে তুমি মৃত্যুর সময় নিজেকে গুটিয়ে এনে আদিত্য দেবতার প্রার্থনা করে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবে। তোমার মন এমন নিয়ন্ত্রণে থাকবে যে, তোমাকে যে একটু পরেই অগ্নিতে দাহ সংস্কার করা হবে, সেটার জন্যও আগে থেকেই অগ্নির কাছে প্রার্থনা করে নিতে পারবে, হে অগ্নি, তোমাকে আমি বার বার প্রণাম করে নিলাম, তুমি এবার আমাকে ভালো পথে নিয়ে চল। ভালো পথে মানে, আমাকে উত্তরায়ণের পথে নিয়ে চল, যাতে আমাকে পিতৃলোকে না যেতে হয়, কারণ পিতৃলোকে গেলে আবার আমাকে জন্ম নিতে হবে। উত্তরায়ণের পথে আমাকে উচ্চলোকে নিয়ে চল, সেখান থেকে যখন সৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে তখন আমারও মুক্তি হয়ে যাবে। এই হচ্ছে ঈশসাবাস্যোপনিষদের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।
।। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ ।। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।।